TGPA -25-08-98—7 07 000—

মন-ভাসির টানে

মন-ভাসির টানে
মন-ভাসির টানে

MON-VASIR TANE—Rs. 10·00
A BENGALI NOVEL
BY
KALKUT
Dey's Publishing c/o Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700073

মন-ভাসির টানে

কালকূট

দে'জ পাবলিশিং । কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—মে, ১৯৬০
—বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১০ টাকা

সব বার্তারই কচকচি আছে। আগে সেইটি সেরে নিই। বললাম অবিশ্যি "কচকচি", কিন্তু শব্দটি আবার সকলের মনে ধরে, তবেই দায়মুক্তি ঘটে। ধরবে কি ? কারণ যাঁরা বিরাট ওজনে বলেন, তাঁরা লম্বা "ভূমিকা" করেন। এখন আমার মতন প্রাণী যদি ভূমিকাকে কচকচি বলে চালাতে যাই, তা হলে অনেক মানীর মন খচখচিয়ে উঠতে পারে।

তবে জোড় হাতে নিবেদন করতে পারি, আমাকে না হয় চলাত কথায় বলতে দিন। "ভূমিকা" বললে, শব্দটির কিছু কিঞ্চিৎ সাজ-গোজের দরকার হয়। হয় না কি ? সাজগোজ বলতে আমি ব্যাখ্যা বন্ধন বোঝাতে চাই। ব্যাখ্যার থেকে "বন্ধন" শব্দটি যেন খাচ্ছে বেশি। কেবল তো "মুখবন্ধ" বললেই সব বোঝানো হয় না, "ভূমিকা" যার আর এক নাম। অবিশ্যি ইংরেজির "প্রিফেস"কে "মুখবন্ধ" বলা যাবে কী না, সে-বিষয়ে আমার ধ্যান ধারণা স্পষ্ট না, কথাটা আগেই কবুল করি। "ফোরওয়ার্ড" শব্দেরই বা মানে কী? ওই যে কী বলে "মুখবন্ধ" জাতীয় একটি শব্দ, ইংরেজি "ফোরোয়ার্ড" কি সেই শব্দে

খাওয়ানো চলে ? আহ্, সব কিছুর ভিতর বাহির না জানলে পরে,, কত রকমে যে ঠেক খেতে হয়। কথা বলবো কি। বলতে গেলেই হিজিবিজি। আসলে মনে মনে ভয়। এ ভয়টাকে যে ত্যাগ করতে পারে, তাকে বলি বন্ধনমুক্ত।

আমিও কেন না নিজেকে বন্ধনমুক্ত ভাবি ? কেন না, আমার মনে হয়েছে, এক আধবার নয়, অনেক বার অনেক প্রকারে, বন্ধনমুক্ত হ'তে পারলে, সে ভাবের ভাবী হয়। আমি তো আসলে বেত্রদণ্ড নিয়ে পণ্ডিতি করতে বসিনি। আমাব সাধনা একটি, হতে চাই "ভাবের ভাবী"। আর পণ্ডিতদের ব্যাপার স্যাপার যদি বলতে আরম্ভ কৰি, তবে, আমার এই নিয়ে বসা ছু-চার প্রস্থ কাগজে আর এক কলমে "কুলাবেক" না। এই "কুলাবেক" শব্দটি দিয়ে তোমার / আপনার নজর কাড়তে চাই। আঙুলের ডগায় ছুই চার চিমটি দিয়ে তুলে, ছু একটি পুরনো বুলি ছাড়ি। আজ থেকে একশো ছ' বছর আগের কথা, "শ্রী" নাম ছদ্মবেশের অন্তরালে, এক পণ্ডিত "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় পত্রাঘাতে "বঙ্কিমঘাতক"-এর ভূমিকা নিয়েছিলেন। অপরাধ ? বিস্তর ! সবিস্তরে কহনে না যায়। তাই আঙুলের ডগায় ছুই চার চিমটির ডগায় ছু একটি পুরনো বুলি উদ্ধারের বাসনা হলো। "শ্রী" কথিত উক্তি, "বঙ্কিমবাবু যেরূপ জঘন্য ভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থা বাঙালা কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটি বঙ্কিমবাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস গ্রন্থনচাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।"

"শ্রী" মহাশয়ের বক্তব্য "শৈবলিনী চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে।" এ সব হচ্ছে রুচিবিকার, জঘন্য ভাব সমূহের কথা। ভাবের ভাবী হতে গিয়ে আমার ঠেক লেগেছে অন্যত্র। উপন্যাস "চন্দ্রশেখর"-এর "শৈবলিনী" পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবক

সমালোচক তুলে ধরেছেন, "পরন্তু বিশিষ্ট রূপে অনুধাবন করিলে বল্লাল সেন ও দেবীবর ঘটকের কীর্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ নিয়ম এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি, তন্মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক।"

"শ্রী" মহাশয়ের মন্তব্য, এরূপ অবিশদ বাঙ্গালা উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নহে। আজিও যদি রামমোহন রায়ের সমকালীন বাঙ্গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। বঙ্গ-দর্শনের লেখকগণ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।"..."অপদার্থ উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটি উপন্যাস শেষ হইলেই অমনি আর একটির জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়ুয়াগণ! (সর্বনাশ, সোমপ্রকাশের "শ্রী" মহাশয়ের উক্তি মতো, আমিও সাহিত্যসম্রাটের মতোই ভাষার "গুরু সাহেবী" দোষ করে ফেললাম যে! "গুরু সাহেবী" দোষের আর এক নাম কি "গুরু চণ্ডালী"? হবেও বা। তথাপি এ আমার মনের সাধ, পাঠকগণ সম্বোধন না করে পড়ুয়াগণ করি। কেন যেন মনে হয়, যে / যিনি পড়ে বা পড়েন, আর লেখে বা লেখেন, চলতি সম্বোধনে ভাবের ঘরে মাখামাখি কিঞ্চিৎ বেশি হয়। লেখার সময় আলাদা কথা। লিখিয়ে আর পড়িয়ে তখন থাকুক গিয়ে যে যার আপনার মনে। তখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অবিশ্যি "শ্রী" মহাশয় বঙ্কিমবাবুকে আরও বলেছেন, ভাষার ব্যাপারে নাকি তিনি "স্বীয় স্ত্রীবিদ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন"।)

অতঃপর আবার, পড়ুয়াগণ! সোমপ্রকাশের "শ্রী" নামক পণ্ডিতদের তোমরা / আপনারা আজিও দেখে থাকো ও থাকেন, চেনো ও চেনেন। শ' বছর আগের সেই আদ্যশ্রাদ্ধ আমার মনে পড়ছে, ভাষা বিষয়ে নিজের নানা ঠেক খাওয়াতে।

কথা যখন তোলা হয়েছে, তার একটা জবাব দরকার। "ফরওয়ার্ড"

শব্দ বিষয়বস্তু কথনের "অগ্রস্থ" শব্দে কি খাওয়ানো (সেই "গুরু সাহেবী" দোষ।) চলে ? যাকে বলা যাবে "আগের কথা"। অথবা নাকি মূলের ধরতাই ? কী বলবো ? অব্যাপারীর ব্যাপারীসুলভ কাণ্ডকারখানার মতন লাগছে। কিন্তু কচকচি শব্দ দিয়ে কথাটা তুলেছি যখন, তখন নিজেকেই বেঁধেছি। এ বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে, আমার নিজের খচখচানিও যে যায় না। তার আগেই অবিশ্যি "ভূমিকা" শব্দ দিয়ে কচকচির মুণ্ডু টানতে চেয়েছি। কারণ আর কিছু না। কচকচি শব্দকে "ভূমিকা" শব্দের দ্বারা মুণ্ড আকর্ষণ, অনেক মাননীয় রচয়িতার মন খচখচিয়ে উঠতে পারে। আমি ভাবের ভাবী হতে চাইতে পারি, কিন্তু একেবারে চোখ বুজে গায়ের জোরে না। "মুখবন্ধ" আর "ভূমিকা" শব্দে তফাত নিশ্চয় আছে। "ভূমিকা"কে শুরুর শুরু বলা যায় ? গানের আলাপের মতন ?

এতেও আবার গোড়ায় গলদের লক্ষণ। গানের আলাপ বিষয়টির শুরু আর শেষ করার মাপজোঁকের কাঁটা যে কোন্ চালে চলে, অনেক সময় তা ধরা বিলক্ষণ মুশকিল। "ভূমিকা" শব্দের সঙ্গে কি তার তুলনা চলে ? চলে না একেবারে বলা যায় না। না হলে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির কথা বলা হয়েছে কেন ? আভিধানিক অর্থে "প্রেফিস" যদি "প্রারম্ভিক মন্তব্য" বোঝায়, সে-মন্তব্যের সাজগোজ অনেক সময়েই তেরো হাত দেখিয়ে ছাড়ে।

এবার তো নিজের বেলাতেই বলতে ইচ্ছা করছে, এক কচকচির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, নিজেই তেরো হাত দেখিয়ে ছাড়লাম। তবু তো এখনও আসল কচকচিতেই আসিনি। তবে, শুরুর মুখে সার্বিক নিবেদনটাই রাখলাম, ভূমিকা না, বার্তা কহনের আগে কচকচিটা সেরে নিই।

গোলমাল। গোলমাল। আবার গোলমাল। ভাগ্যের কী গুনাহ্ যে সোমপ্রকাশের বঙ্গদর্শনের "অপদার্থতা" বিষয় গোড়া থেকেই

মনে পড়ে যাচ্ছিল, তা আমি জানতাম। আসলে সকলের কাছে ক্ষমা ঘেন্না চেয়ে, আমার ভাবের ভাবী হওনের বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ সহজ সরল করে নেওয়া। ভাষার দোষ বৈলক্ষণ্যে কেউ না আবার আমার একান্ত "গৃহপুষ্ট ব্যাকরণ"-এর সন্ধানে লিপ্ত হন। গোলমালের ঠেক লাগলো "বার্তা" শব্দে। সোমপ্রকাশের শ্রী নামক ভূতেরা নানা ভাবে বেঁচে আছেন। এমনিতেই তাঁদের মতে সমাজে প্রচলিত শব্দের দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি অতিশয় অপরাধ, বাঙলা সাহিত্যেরও মুণ্ডপাত। "বার্তা" কহন বহন সবই করা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা তো বার্তাবাহী হতে পারে না। প্রচলিত অর্থেও, বার্তা হলো খবর বা সংবাদ। কখনো বা জনশ্রুতি। এই তো আমার টেবিলের পাশেই একটি পত্রিকা রয়েছে, "অমুকবার্তা"। কথার সঙ্গে বার্তার একটা পিঠোপিঠি সম্পর্ক আছে। ঠিক তেমন করে কথা কইবো বলেও, কচকচি করতে বসিনি। কেন না, সেই পিঠোপিঠির মধ্যে দেওয়া নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। অবিশ্যি আমার ধারণা। লিখিয়ে আর পড়িয়েদের মধ্যে, একটা অন্তর্নিহিত কথাবার্তার সম্পর্ক আছে। কিন্তু লিখিয়েদের লেখার সময়টাতে সে অতি নির্মমরূপেই একাকী। অন্যথায় যোগসূত্রটাও ঘটে না।

যাই হোক "বার্তা" নিয়ে আর কচকচি না। যদিও "বার্তাবহ পাখী"র সঙ্গে দূতেরও একটি ভূমিকা যুক্ত। সেই অর্থে, যদি হতে পারতেম সেইরকম এক দূত, "যাও পাখী বলো তারে / সে যেন ভোলে না মোরে" তবে "বার্তা" শব্দই বজায় রাখা যেতো। কেন না, এই রকম দৌত্যের মধ্যে বার্তাবহের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আর সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে, বিরহী বা বিরাহিনীর আলিঙ্গন চুম্বনও দূতের কপালে জুটে যেতে পারে। দানপানীর তো কথাই নেই। কিন্তু এ জন্মে আর সে আশা নেই।

কচকচিটা আর কিছু না, ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা নতুন কৈফিয়তের

অবতারণা। এই "অবতারণা" শব্দটিকে নিয়ে অনেক কথার সূচনা। আসলে, সেই কবে এক আদ্যিকালে "মন চলো যাই"-এর ফেরে ফিরেছি, এবার আর তেমন ফেরে ফিরবো না। "কৃষ্ণ অনুরাগ"-এর প্রতীকীটা প্রাণ থেকে হটানো দুষ্কর, কারণ "কৃষ্ণ" নামটি কেমন যেন চুম্বকের মতো ধ্যানে ঠাঁই নিয়ে আছে। অথচ যথার্থ "কৃষ্ণ" দর্শনে কদাপি কখনো যাইনি। কবে এক "ভোলার মন" প্রেমিকের ডাকে, কথাটা আমার প্রাণে গছে গিয়েছে, আজ তক তার "ন্যাওটো" ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

তবে, এবার কাটাতে চাই। "কৃষ্ণ অনুরাগী বাগানে" যাবারও আগে, সেই পঞ্চাশ দশকের গোড়ায়, জীবনের একটা পর্বে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন "কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগান" থেকেও, কাঁধে কাঁথা ঝুলি নিয়ে "ভারত"কে এক বাগানের নানা ফুলে ফলে দেখবো বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। "ভারত উদ্ধারের" সীমানায় দাঁড়িয়ে তখন একটা কথাই ধিক্কারে আর আবেগে মনে এসেছিল, "ভারত" না দেখেই উদ্ধার? দেখা যায় বা কেমন করে?

না, না, সে হাটের কেনা বেচায় আছে বা মাঠের হালে বলদে আছে, কিংবা আছে সবাইকে নিয়ে ঘরকন্নায়, সেই দেখা না। চিত্তে ফাটল ধরে না, ভেঙে ব্যাখ্যাও করতে পারি না, কিন্তু এটা বুঝি, সব নিয়ে থুয়েও তার আর একটা রূপ আছে। সেইখানেই যেন সে নিজের অজান্তে আসল রূপ নিয়ে আপনার মতন করে আছে। সেখানে সে ঘরসংসারের কল্যাণের জন্য ছুটে গিয়েও, সেই কথাটাই ভুলে যায়। কল্যাণের অন্য এক ধ্যানে সে ডুবে যায়, নিজেও জানতে পারে না। সেখানে সে নিজের কাছে অচেনা।

হ্যাঁ, জানি, সকলের কথায় সকলের সায় থাকে না। আমার কথায় সকলের থাকবে, এমন আশা করি না। মানুষকে তো দূরের কথা, মানুষ নিজেকে সকলের সঙ্গে কোনোদিন এক করে

মিলিয়ে দেখতে চায়নি। মানুষের কি এটা অহংকার? নাকি সে অসহায়?

তা সে যাই হোক গিয়ে, আমি কোনো কূটকচালে নেই। আমি কোনোদিন সাব্যস্ত করে দিতে পারবো না, কে কী নিয়ে অহংকারী। কে কী নিয়ে অসহায়। তবে হ্যাঁ একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, যার মনে যতো কূটকচালির গরলে উথালি পাথালি, সে যেন ততো অহংকারী, ততোই অসহায়। আসলে সেকি বড় কষ্টের কথা? জবাব আমার জানা নেই। তবে, রে রে ক্ষ্যাপা হা হা দুঃখী, দপদপিয়ে চলেছে এই সংসারের বুকে দাপিয়ে, অথচ "আমি নিরেট ভদ্দরলোক গ" বললে বড় কেতা, মুখে অমায়িক হাসি, এমনটি অনেক দেখেছি, দেখছি। কিন্তু সে-কথা আমি বলতে বসিনি।

কচকচির কথায় ফেরা যাক। সেই "ভারত" দেখার কথায়। "ভারত" তার যে-জনপদ থেকে আপন ঘব সংসারের মঙ্গল শংখ বাজাতে বাজাতেও এক জায়গায় এসে, সে জগত সংসারের আর এক আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে, নিজের নিয়ে আসা রূপটাকেই চিনতে পারে না। সে আঙিনাটা আবার কোথায়?

কথা অনেক সময় বড় খিটকেল হয়ে ওঠে। জানবোই যদি, তবে তো ব্যাখ্যা করেই দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, আঙিনাটা ঘরকন্নার প্রত্যহের উঠোনে না। অন্য এক উঠোনে। যেখানে সে ঘর করার অনেক বেশ ছেড়ে একমাত্র বেশে দাঁড়িয়ে। সেখানে তার ধরাচূড়া বসন ভূষণ কিছু নেই। হয়তো সেখানে সে নগ্ন, কিন্তু দীন না, কেঁদে হাত বাড়িয়ে তোমার দয়া চায় না। তবু চোখে তার জল দেখতে পেতে পারো। তোমার বচনবিন্যাসে কুলাবে না, এমন মোহন হাসিও দেখতে পাবো। আমার হিসাব জানা নেই, এমন উঠোন জগতের আর কোথায় কোথায় আছে।

ভ্রূকুটি করছেন? করছো? বলেছি তো, তর্কে নেই। যুক্তি দিয়ে

কতো গৃহ গৃহান্তরকে বাঁধবে? তবে হ্যাঁ, কচকচির গর্বটা সেরে নিতে গিয়ে এটুকু আগে বলে নিই, তেমন কোনো আঙিনায় যাবো না। অমৃত খুঁজতে গিয়ে নাম একটি নিয়ে ফিরেছি। জীবনে বুঝেছি, ওইটি সার। কিন্তু পষ্টাপষ্টি কথা, গোড়া বেঁধেও না। শেষ যাত্রার বিন্দুবিসর্গও না। কেন? না, আমার মন ভালো না। আমি এবার যেখানে যেমন খুশি যাবো, যেমন খুশি বেড়াবো। আমার ঢাক ঢোল পেটাবার কিছু নেই।

সেই কবে প্রয়াগে যাত্রা করলাম, তারপরে আর আমার একটু নীল আকাশের খোঁজে যেতে, ঘাটের ধারে, হাটের সীমানায়। পুকুর পাড়ের পৈঠায় কেউ বসতে দিলে না। দিলে না বললে পরের দোষ গাওয়া হয়, নিজের মনকেই পাচনতাড়ি দিয়ে হৈ হৈ করে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। কবেই—সেই প্রথম থেকেই বলে দিয়েছি, আমি না কৌপীন আঁটা ঘর ছাড়া না বিবাগী বৈরাগী। এমন কি, আজ আরও দুটো কথা হলফনামা দিতে হবে আমাকে। দেবার আগে জোড় হস্তে নিবেদন, আমার অযোগ্যতাকে নিয়ে কেউ যেন না ফুট কাটেন। আমি কারোকে নিয়ে যেতে পারবো না পর্বতের সেই আশ্চর্য মহিমময় লীলাখচিত প্রাঙ্গণে। পারবো না অজানা দেশের দেবদেউলের সন্ধান দিতে। আর ডাইরি বা গাইড, ভ্রমণ-বিলাসীদের হাতে তেমন মনমনোহর কিছু তুলে দিতেও পারবো না। কারণ ভূগোল ইতিহাস পুরাতত্ত্বের জ্ঞান দেবার দম আমার নেই।

তবে কী দিতে পারবো?

কিছু না। কেবল আপন চলন বলন বিবরণ। তারপরে তোমার মনে তুমি, আমার মনে আমি। দেনা পাওয়ানা নিয়ে কোনো হিসাব নিকাশ পেতে বসতে পারবো না। ওটা যার যার, তার তার। দেনেওয়ালার আর লেনেওয়ালার। দেনেওয়ালার দিয়ে কি মন ভরে? লেনেওয়ালার নিয়ে কি মন ভরে? লেনেওয়ালার নিয়ে কি সাধ

মেটে ? যত্তো ব্যাজের কথা। এর আবার কোনো জবাব আছে নাকি ? বলাই তো হয়েছে, ওটা যার যার, তার তার। এসব বেশি ভেঙে বলা চলে না।

অতএব, তাই সই। কিন্তু কোথায় ? কতো দূরে ? এ কথা বললেই তো সেই আবার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা আসে। ও সবের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কেন না, আগেই বলা হয়ে গিয়েছে, এবার গোড়া বেঁধেও না, শেষ যাত্রার বিন্দুবিসর্গও নেই। তবে যাত্রাটা কেমন ? এলেবেলে। যেমন খুশি। একে কি মনবিলাসী বলা যায় ? অথবা না হয়, আমার সেই আগের কথাটাই থাকলো, ভাবের ভাবী। কিন্তু ভাবেতে কি সংসারে হাঁড়ি চড়ে ? কথায় কি চিঁড়ে ভেজে ? সেই কথাটাও মনে রাখতে হবে। মনবিলাসী ভাবের ভাবী, যা-ই বলা যাক, জীবের কর্তব্য থেকে মুক্তি নিয়ে আসিনি। বন্ধনমুক্ত বটে, আসলে বৃহৎ বন্ধনেই নাড়ি জোড়া আছে। কেননা, একটা কথা বুঝেছি। মুক্তি এই সংসার থেকে। আবার মুক্তি এই সংসারেই ? মুক্তি মানুষের কাছ থেকে, আবার মানুষের সঙ্গেই। যা ছাড়িয়ে গিয়েছি, তা ছাড়িয়ে যাইনি।

কথার একটা নিজের দৌড় আছে। একবার ছুটলে রক্ষা নেই। তাকে না থামালে, মোদ্দা কথায় আসা যায় না। কচকচি অনেক হয়েছে, এবার শুরু করা যাক।



যেথাকার নাম বাঁশবেড়ে, তারই পোশাকি নাম বংশবাটি। জায়গার নাম করলেই লোকে আগে রাজবাড়ি আর মন্দিরের কথা ভাবে। আমি আসলে, বাঁশবেড়ের চটকল পেরিয়ে সেই ত্রিবেণীর হাতায়। যেখান থেকে বাস আর এগোয় না, পেছোয়। হালের

হালচাল চেহারা পথঘাট কেমন দেখতে হয়েছে, জানি না। অনেক দিনের সাধ, একদিন চলে যাবো চুঁচুড়োর ভিতর দিয়ে, গঙ্গার ধার ঘেঁষে, শাগঞ্জের সীমানা পেরিয়ে। গন্তব্য কোথায়? না, ত্রিবেণীর ঘাট।

এ আবার কেমন ভ্রমণ? রাত ভিখিরির মতন, মন-ভিখিরির পথ চলা। কেননা, অনেকদিন যাবত মনটা ওই পথটাকে ভিড় করছে। সেই যেখানে, চটকলের শেষে, চারপাশের খোলা জায়গায় কনডাকটর যাত্রীদের হ্যাট হ্যাট করে নামিয়ে দেয়, সেই ত্রিবেণীর ছাতায়। আসলে সেটা ত্রিবেণী না। পথ কিছু ভাঙতে হবে। মাঠের পথ। ডান পাশে ঢেউতোলা টিনের বড় বড় শেড, গঙ্গাকে আড়াল করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সারি সারি অনেক শেড। রাস্তা থেকেই শোনা যায়, শেডের মধ্যে, বয়সের হিসাব ছাড়া যতেক বামাস্বরের হাঁকডাক গুলতানি। কান পেতে শুনলে বচনের সবটাই পুবদেশী। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে, গোঁ গোঁ করে খালি মোটরবাসটা ঘুরে আসতে, বড় মুখ করে কনডাকটরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কিসের শেড, কারা থাকে?'

কনডাকটরের জবাব শুনে কান দুটো ঝাঁঝিয়ে উঠলো। লিখে বলি, কলমের এমন অসহবত বুকের পাটা নেই। অথচ কনডাকটর সহিসের সঙ্গে ড্রাইভার হা হা হেসে, ভেঁপু ফুঁকতে ফুঁকতে বাস চালিয়ে নিয়ে চলে গেল। যেন কী মজাই করে গেল। আজকের কথা না, অনেক দিনের। তা পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ের তো বটেই। হালফিল যেমন মোটরবাসের বা লরি-ট্রাকের কানের পর্দা-ফাটানো যন্ত্রের ভেঁপু বাজে, তখনও তেমনটা বাজারে আমদানি হয়নি। অন্যায়টা আমারই হয়েছে। আমি তো আর একটা যাত্রী নামিনি। চটকল পেরিয়ে, শেষ স্টপেজে, আরও দু-চার যাত্রী নেমেছিল। তাদের জিজ্ঞেস করলেই পারতাম। কৌতূহল যখন মনে জেগেই ছিল।

তবে অন্যায়ই বা বলবো কি। কারখানা আর কুঠির সীমানা ছাড়িয়ে, চারপাশে ছড়ানো পোড়ো জমি মাঠ কাঁচা-পাকা ভাঙা রাস্তা, দু-চার যাত্রীরা যে কোথায় কেমনে এদিকে-ওদিকে চলে গেল, দিশা পেলাম না। একদল মোটরবাস হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার আগে, কান-ঝাঁঝানো খেউড় শুনিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। তারপরেই তো আবার শুনি খিলখিল হাসি। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, টিনের শেডের গায়ে যেন কেউ খামচা দিয়ে সুড়ং খুলে দিয়েছে। সেই সুড়ংয়ের ফাঁকে দুটি ন'বউয়ের মুখ। মানে নতুন নতুন লাগলো, বোধহয় বয়সের জন্য, আর হাসির চালে। সিঁথির সিঁদুর যতো চওড়া না, কপালের ফোঁটা তার থেকে মস্ত। যেন অশোক গাছের ওপারে এইমাত্র সূর্যোদয় হলো।

না, আমার দিকে তাদের নজর নেই। হাসিতে আওয়াজ থাকলেও, দুজনের মুখ প্রায় মুখে মুখে ঠেকানো। কথাবার্তা চুপিচুপি। তাদের রূপ দেখবার সময় আমার ছিল না। আটপৌরে শাড়ির ঘোমটায় কেউ অপ্সরী কিন্নরী না হোক, চোখের কালো তারায় বিস্তর রঙ্গরসের ঝিলিক। তাতেই তারা রূপসী। ওরকম মালগুদামের মতন টিনের শেডের ভিতরে কেন তারা। করছেই বা কী?

পথ চলতে পথের সব বৃত্তান্ত যদি জানতে হয়, তবে আর গন্তব্যে পৌঁছুবার সময়ের ঠিকঠিকানা রাখা চলে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত শুনতে পেলাম না, সময়কে কেউ নিজের হাতে করে নিয়ে এসেছে। সময় সকলের রাজা হয়ে জগৎটাকেই চাপিয়ে নিয়ে চলেছে নিজের রথে। আমার দাঁড়াবার সময় নেই। বাঁ দিকের দূরের গাছপালার মাথার ওপরে, রবিখন্দের ঋতুর সূর্যের আকার যতো বড় হয়েছে, রঙে তার থেকে বেশি রাঙা। ছায়া এখন পূবে শায়ন নিচ্ছে। আমি হাঁটা ধরলাম।

এমনটা হবার কথা ছিল না। বেরিয়েছিলাম তো গতকাল।

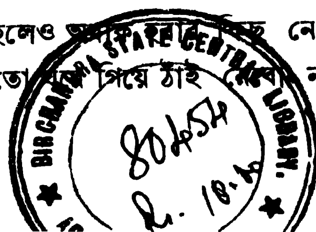
তখন মনের কথা, যাই একবার ত্রিবেণী ঘুরে আসি। কিন্তু অনেকদিন ধরেই, ওপারে হালিশহর আর এপারে বাঁশবেড়ের গঙ্গার মাঝখানের সবুজ লম্বা চরটা হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করেছে। চোখে দেখেছি, কানেও শুনেছি। ওপার থেকে, এপার থেকে, দুপার থেকেই। কতোদিনই তো দুপারে দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওপারের লোক নৌকায় ভেসে চরে। চর পেরিয়ে আবার নৌকায় ভেসে ক্যাওট শাগঞ্জে আর বাঁশবেড়েতে। আবার এপার থেকে ওপারে, চরের ওপর বিহার করে, হালিশহরে।

ব্যাপার তো এমন কিছু না, যে বোঁচকাবুচকি বাঁধতে হবে, ঝোলাঝুলি নিতে হবে। পাড়ি দিতে হবে দূরের পথে। ভেসে গেলেই তো হয়।

আহ্, ওইখানেই তো যতো মন্তরতন্তর। যোজন পথ পাড়ি দিয়ে এলে, ঘরের পিছনের দরজা খুলে তাকাবার একদিন সময় হলো না। যেন ও-পথে কেউ মন্ত্র পড়ে রেখে দিয়েছে। খবরদার, যেও না।

গতকাল ত্রিবেণী যাবার পথেই সব তালগোল পাকিয়ে গেল। শাগঞ্জের ভিতরের রাস্তা দিয়ে, বাসে করে, সকালের ঝলকানো রোদ গায়ে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। বাসের জানালার ধার ঘেঁষে বসেছিলাম, ডান দিকে। চলেছিলাম আপন মনে, গঙ্গা দেখতে দেখতে। ওপারে হাজিনগরের কলকারখানার চিমনি ইমারত কুঠি। আর এপারের সরু রাস্তায়, প্রায় এ-দেওয়ালে ও-দেওয়ালে ধাক্কা মারতে মারতে বাস ছুটে চলেছে। হঠাৎ গঙ্গার মাঝখানে সেই সবুজ চর!

সবুজ চর। দু-একটা মানুষের অস্পষ্ট মূর্তি। বেশ ফারাকে ফারাকে এক-আধটা চালা ঘর। ঘরই তো? সন্দেহ হয়। এ-পাশে জল, ও-পাশে জল, মধ্যখানে চর। তীর থেকে যেন ঠিক কিছু বোঝা যায় না। ঘর না হয়ে, খড়ের গাদা হলেও [illegible] কিছু নেই। কিন্তু তাতেই বা আমার কী? আমি তো [illegible] গিয়ে ঠাই [illegible] না।



ঠং করে বাসের ঘন্টি বেজে উঠলো। কারা যেন নামলো। আমিও জায়গা ছেড়ে বাসের দরজার দিকে। সেইবেলায় কনডাকটরের নজর কর্তব্য বোধশোধ ভালোই, 'ও মশাই, আপনি নামছেন কোথায়? ত্রিবেণীর স্টপেজ চটকল ছাড়িয়ে, এখনও বাঁশবেড়েই আসেনি। যান, জায়গায় বসুনগে।'

শাস্ত্রে অনেক কথা বলেছে বটে। গৃহের চৌকাঠের ওপার থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখিস বউ। অমঙ্গল মনোহর বেশ ধরে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে। আঁচল উড়িয়ে চলে যাবি, দরজায় কাঁটা পড়বে। এ-জীবনে আর ফেরা হবে না। সবুজ চরের অনেক দিনের হাতছানিটা আমার প্রতি সেরকম কী না, জানা ছিল না। গতকাল আর থাকতে পারিনি। কনডাকটরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে, নেমে পড়েছিলাম। বেশি পয়সা দিয়ে আরও দূরের পথের টিকেট কেটে, মাঝপথে নেমে পড়ে যে যাত্রী, সে 'শালা' যে 'বুদ্ধু' বাসের কনডাকটর আর সহিস ছাড়া সে-কথা কে বুঝবে? মরুক গে। নামছে, নামতে দাও।

হ্যাঁ, দেখাই যাক না। এতদিনের এতো হাতছানি, সবুজ একখানি চরের এত ফুঁসলানি কিসের? দেখে আসতে দোষ কী? চরকে ঘিরে, স্রোতের জলের বাঁকের রেখা এক-একখানে এক-একরকম। সে সব বুঝবে মাঝি। ঘাট কোথায়? একবার ভেসে যাবো, চরের বুকে একবার নামবো। মন চাইলে পায়ে হেঁটে একটু ঘুরে দেখবো, আবার তীরে ফিরে এসে. ত্রিবেণী গেলেই হবে। কেউ তো মাথার দিব্যি দিয়ে দেয়নি, ত্রিবেণীর ঘাটে যেতে হলে, দু দণ্ড যাত্রা ভঙ্গ করা চলবে না।

আশেপাশে খান কয়েক বাড়ি। কয়েক পা এগিয়ে, গঙ্গার উঁচু পাড়ের ওপরে এক পাশে একটি চালাঘর। তার পাশে রাজ্যের লোহা আর টিনের ভাঙাচোরা টুকরোর স্তূপ। আর এক পাশে ছেঁড়া পচা চটের থলি ডাঁই করা। চালাঘরের দরজার সামনে খাটিয়ার ওপর

খালি গায়ে বসে একজন বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ঘষছে। বলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয় না, নেশার মৌতাত তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ খৈনি। মাঝ বয়সী লোকটি, গায়ে-গতরে শক্তপোক্ত, ছাই রঙের একজোড়া গোঁফ। মাথায় কদম ছাঁটের থেকেও যদি কিছু কম হয়, সেই রকম চুল। একেবারে কামিয়ে নিলেই বা দোষ কী ছিল? জল আটকাবার তো উপায় নেই। উনিশ আর বিশ। তবে হ্যাঁ, গোঁফের রঙ ছাই হোক, মাথায় মোটা টিকির গোছটি বেশ কালো। পরনের খাটো ধুতিখানি হাঁটুর ওপরে তোলা।

আমার দিকে লোকটা ফিরে তাকালো না, ভাঙাচোরা লোহা টিনের টুকরোর স্তূপের দিকে যেন বড় স্নেহের চোখে তাকিয়ে দেখছে, আর খৈনি ডলছে। আমার নজর তার দিকে পড়ার কারণ, আওয়াজ দেয় কী না। কারণ, আমি দেখছি, মাথায় চটের একটা বস্তা নিয়ে এক বুড়ি ঘরের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে এগিয়ে চলেছে। আগেই আমার চোখে পড়েছে, ছই ছাড়া কিছু নেই, এমন কি পাটাতনের বালাইও নেই, নাচে জলের ধারে ছোট একটা নৌকা পাড়ে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে। নৌকার সামনের গলুইটা ভাসছে উত্তর দিকে। তার মানে নদীতে জোয়ার।

আমার উদ্দেশ্য লক্ষ্য আর অনুমান, সব মিলেমিশে একটাই। মনের জিজ্ঞাসাও। ওরকম একটা আনকা ঘাটে নৌকাটা কী কাজে লাগে? বুড়িটাই বা কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘাট আঘাটা যাই বলা যাক, ওদিকেই নেমে যাচ্ছে কেন? বুড়িটা এলোই বা কোথা থেকে, খেয়াল করিনি। প্রথমে লক্ষ্য পড়েছিল নৌকাটার দিকেই। তারপরে বুড়ির দিকে। কিন্তু লোহা-লক্কর আর ছেঁড়া পচা চটের ডাঁইয়ের এলাকার ধারে বাঁধা নৌকাটা দেখে একটাই অনুমান করা যায়। নদীর মাঝখানে চরের সঙ্গে কেমন যেন একটা যোগাযোগ আছে। আজ পর্যন্ত, গঙ্গার এপারে ওপারে নাবার পথে, সবুজ চরে

যাবার জন্য কোনো নিয়মিত খেয়া পারাপারের নৌকা দেখিনি। আর খেয়া পারাপার করতে হলে যেমন নির্দিষ্ট একটা ঘাট থাকে, তাও কখনো দেখিনি। কথাটা নিয়ে অনেকদিন ভেবেছি। কাদের নৌকা, কোথায় থাকে, কারা কখন যাতায়াত করে? অথচ পারাপার করতে দেখেছি। তবে ঘাটের কোনো ঠেক দেখিনি।

সবুজ চরটার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, গঙ্গার মাঝখানের নিরিবিলিতে, দু পাশের স্রোতে ভেসে সে বেশ সুখেই আছে। মজা আর বর্ষা ঋতুতে সে তার শরীরের কাঠামো বদলায়। কখনো এক-দিকে বাড়ে তো, আর একদিকে কমে। কখনো বুক উচু, তো পায়ের দিকটা বাঁক নিয়ে চলে যায় উত্তরে, সেই ত্রিবেণীর দিকে, যেখানে দক্ষিণগামিনী গঙ্গা এমনিতেই বাঁক নিয়েছে, আর হালিশহর বাঁশবেড়ের কাছে এপারে ওপারে অনেকখানি চওড়ায় শরীর ছড়িয়েছে। এই কি নদীর নিয়ম নাকি কে জানে, বাঁকের মুখে সে যেন দু কূলে দূরে ছাড়াছাড়ি। ক্ষীণ কটির পরেই হা হা বহর বুক। কখনো নদী চরের মাঝখানের সমতলকে গর্ভিনীর মতন বিশাল করে তোলে। দক্ষিণে মাথাটা শন নুড়ি চুলের মতন, বড় বড় মাটির ফাটলে এঁকেবেঁকে জলে ডুবেছে। আবার তো কোনো কোনো শরতের মাঝামাঝি সময়ে দেখেছি, নদীর মাঝখানে যেন একটি সবুজ রেখা জেগে আছে। নজর করে না দেখলে মনে হয়, একটা লম্বা সবুজ ফালি ডুবু ডুবু হয়ে ভেসে যাচ্ছে। দূরের স্থল থেকে দেখ তার একরকম কথা আসলে কোনো কোনো বছরে, ভাদ্র আশ্বিনের মধ্য ঋতুতে, গঙ্গার তখন বাড়াবাড়ি অবস্থা। সে তখন অলক্ষ্যে চরটিকে তার নিজের মতন ভেঙে গড়তে থাকে।

তা থাক, যে-কথা বলছিলাম, সবুজ চরটি গঙ্গার মাঝখানের নিরিবিলিতে, তার ভাঙা-গড়া যেমনই হোক, সে যেন বেশ নিশ্চিন্তে আছে। তার দু পাশের দুই কূলের স্থলে, এতো যে কলকারখানা,

ইঁটের ভাটি, বিশাল জনপদ, দিনে রাত্রে ধাবমান যানবাহন, বিজলি-বাত্তির রোশনাই, কলকুঠির রাজকীয় প্রাসাদ আর তার জীবন নিয়ে অনিত্যের কোলাহল, কোনো কিছুর দিকেই তার নজর নেই। অথচ দেখলে এমন মনে হয় না, সে অহঙ্কারে গা ভাসিয়ে আছে, বা গোঁ ধরে আছে, দুই তীরের কোনোদিকেই সে তাকাবে না, কান পেতে কিছু শুনবে না। আসলে সে নিজের রঙ্গেই আছে। যাকে বলে, আপনাতে আপনি মজেছে। মনে হয়, কাছেই। প্রকৃতপক্ষে চেহারার চরিত্রে আর স্থান মাহাত্ম্যে আছে সে অনেক দূরে।

দুই তীরের সময় কোথায়, দরিয়ার মাঝখানে এক অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখবে। তীরের অনেক দায়দায়িত্ব ব্যস্ততা। তবু নদীর বুক থেকে, হাতছানি দেয় কেমন করে? কেবল কি হাতছানি? ঠোঁটের কোণে আঙুল রেখে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকা এক অপার রহস্যের ছোঁয়াও যেন রয়েছে সেই হাতছানিতে। এখন কথা উঠতে পারে, হাতছানিটা দেখা যায় কেমন করে।

আজ পর্যন্ত এ কথাটার জবাব কোনো "ঠাকুর" মশাইও দিতে পেরেছেন কী না জানি না। শুনিও নি। তবে আমার মতে সোজা কথা, জাত পাত বলে কিছু নেই। হাতছানিটা আছে, বলতে গেলে সর্বব্যাপী, সকলের প্রতি। কারোর চোখে পড়ে, কারোব পড়ে না। যার পড়ে, সে পা না বাড়িয়ে পারে না। যার পড়ে না, সে অন্য পথে পা বাড়িয়ে আছে। এই রকমফের নিয়ে আমরা রকমারি।

লোহা আর টিনের টুকরো স্তূপ আর ছেঁড়া পচা চটের ডাঁই দেখে, জায়গাটাকে অনেকটা ইঁট চূণ শুরকির গোলার মতন দেখাচ্ছিল। চালাঘরেয় দরজার সামনে, খালি গা, হাতের চেটোয় খৈনিমর্দনকারী, কালো তৈলাক্ত মোটা গোছার টিকিধারীর আওয়াজ নিয়ে, ভয়টা সেই কারণেই ছিল। জায়গাটা নিশ্চয়ই লোক চলাচলের সদর রাস্তা না।

ঘাটে একটা নৌকা জোয়ারের টানে ভাসলেই সেটা খেয়াঘাট হয়ে যায় না। লেখা না থাকলেও প্রবেশ নিষেধ-এর সীমানা চেনা যায় পাঁচিল ঘেরা না থাকলেও, গৃহস্থের খোলা সীমানার এলাকায় নিষেধের নোটিশ ঝুলিয়ে রাখে না। চলতে গিয়ে পা আপনা থেকেই এড়িয়ে চলে। খৈনিমর্দনকারী হঠাৎ মুখ তুলে আওয়াজ দিলেই, বেকায়দায় পড়ে যাবার ভয় ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, আমার দিকে সে ফিরেও তাকালো না। গভীর মনোযোগ আর মমতায় ভাঙা-চোরা পুরনো লোহা টিনের স্তূপের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দেখছে, কোনো দিকেই তাকাবার অবকাশ নেই।

ভূতের সামনে দিয়ে রামনাম জপের মতন আমি চটের বস্তা মাথায় বুড়ির পিছনে পিছনে একেবারে উঁচু পাড়ের ধারে চলে গেলাম। চালার দরজা তখন আমার পিছনে। দেখলাম, বুড়ির নজর কোনোদিকে নেই। শক্ত পাড়ের ঢালুতে সাবধানে পা ফেলে নেমে দাঁড়ালো গিয়ে একেবারে নৌকাটার কাছে। অনায়াসেই মাথার বোঝাটা নামিয়ে ধূলি ধোকড়া কাপড়ের ঘোমটা নামিয়ে, আগে খস খস করে, জট বাঁধা রুক্ষু পাটের ফেঁসোর মতন চুলে দু হাতে চুলকে নিল। আমি তার পিছনটা দেখতে পেলেও কাপড় পরার ধরন দেখেই অবাঙালী পরিচয়টা চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি। ওপরের চালাঘরের দরজার সামনের লোকটিও যে অবাঙালী, তাও এক নজরেই চিনে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে কোনো দূরদৃষ্টির পরিচয় নেই, আমার মতন যে-কোনো বঙ্গ সন্তানই তার সীমান্তপ্রদেশের লোককে চিনতে পারে। বিশেষ, কলকাতা আর তার পঁচিশ পঞ্চাশ মাইলের উত্তরে দক্ষিণে যারা বিচরণ করে।

আমার লক্ষ্য বুড়ির দিকে। মাথা চুলকানোর বহর দেখলেই বোঝা যায়, কেবল জটার ময়লার দোষ না। চুলের গোড়ায় গোড়ায় উকুনের নির্ঘাৎ উৎপাত। নিশ্চয় অনেকক্ষণ থেকেই উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে। মাথার বোঝা বাদ সেধেছিল। আমার নজর তখন

সবুজ চরে নেই, নদীতে নেই, একমাত্র কাজ বুড়ির মাথা চুলকানো দেখা কারণ, বুড়ির পরবর্তী কর্মসূচীর ওপরেই আমার সব কিছু নির্ভর করছে। যদিও মন বলছে বুড়ি বোঝাটা পাড়ে রেখে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য নামেনি। তার লক্ষ্য নিশ্চয়ই নৌকা।

আমার এই ভাবনার ফাঁকেই বুড়ি তার ধূলি ধোকড়া কাপড়ের ঘোমটা তুলে কয়েক দফা ঝাপটা মারলো মাথায়। সকালের রোদে স্পষ্ট ধূলা উড়তে দেখলাম। তারপরে গায়ের ঢলঢলে জামাটার ডান দিক দিয়ে আঁচল টেনে মাথায় আবার ঘোমটা টেনে দিল। রূপেই বা কী করে, বয়সেই বা কী যায় আসে। অঙ্গের বস্ত্র? হয়তো শাড়ি ধূতি থান বলে বোঝার উপায় নেই। ধূলা ঝুলা ন্যাকড়া, তালি তাপপি সেলাই বিস্তর থাকতে পারে। কিন্তু হাটে ঘাটে মাল মাথায় করে ঘুরে বেড়ালেই যে সহবত থাকবে না, এমন কথা কে বলেছে? ঘোমটা হলো সহবত। তারপর?

তারপর বুড়ি যেমন অনায়াসে মাথার চটের বস্তাটা নামিয়েছিল তেমনি অনায়াসেই দু হাতে তুলে প্রায় ছুঁড়েই ফেললো নৌকার খোলে। নৌকার খোলের মাঝখানে অল্প স্বল্প জল, মাঝে দু এক ঘটি হতে পারে। কিন্তু বুড়ির হাতের নিশানা অব্যর্থ। বস্তাটি জল বাঁচিয়ে গলুইয়ের ধার ঘেঁষে পড়লো। এবার কি বুড়ি নৌকায় চাপবে নাকি? নৌকো বাঁধা খুঁটিটা যে লগি, তা বোঝা যায়। একটি বৈঠাও গলুইয়ের পাশেই খোলের ভিতর দিকে কাত করে রাখা। বুড়ি কি নিজেই নৌকা বাইবে নাকি?

অবাক মানবার কিছু নেই। পুব দেশে আমার ঘর। অমন অনেক বৃদ্ধা পাটনী দেখেছি।

আমি নীচের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করে থমকে গেলাম। বুড়ি মুখ ঘুরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে পুরো দেহাতী ভাষায় যা বলে উঠলো, তার মানে হলো, "কী হে মরদ, গা ঝাড়া দেবে না কী?"

থমকানোর থেকে চমকে গেলাম বেশি। পা বাড়ালে শক্ত ডাঙাতেই হড়কে পড়তে হতো। নৌকা আর বুড়ি ছাড়া সবই আমার অলক্ষ্যে ছিল। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, জোয়ারের জল ছুঁই ছুঁই, পাড়ের ওপর এক গাছ। গাছের গোড়া শান বাঁধানো না বটে, তবে ইঁট দিয়ে সাজানো। অনেকটা বাঁধানোর মতনই। গায়ে গতরে শক্তপোক্ত হলে ওই সাজানো ইঁটের পাঁজার ওপরেই দিব্বি শোয়া বসা যায়। আধশোয়া অবস্থায় পা ছড়িয়ে, কাত হয়ে, হাতের ওপর গাল রেখে প্রকৃতই এক মর্দ বিড়ি টানছিল। কিন্তু সে না দেখছিল আমার দিকে, না বুড়ির দিকে। চরের দিকে মুখ করে আপন মনে বিড়ি টেনেই চলেছে।

আমি বুড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম, ভুরু কুঁচকে বুড়ি আমাকেই দেখছে। দৃষ্টিবিনিময় হলো, কিন্তু শুভদৃষ্টি কী না তা বুঝতে পারলাম না। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গাছতলার মরদের দিকে এগিয়ে চললো। তবে বুড়ি বুড়ি করে যতোটা বুড়ি ভেবেছিলাম, ততোটা বুড়ি সে না। বয়সের লেখাজোখায় যতোটা লোলরেখায় আঁকা মুখ ভেবেছিলাম, গোটা মুখখানির চামড়া সেরকম নয়। পাটের কেঁসোর মতন চুল বটে, সেটা তেলজলের অভাবে হতে পারে। রোদে পোড়া মুখের চামড়ায় কিছু ভাঙাচোরা ভাঁজের দাগ। আমার দিকে তাকাবার সময় আপনা থেকেই তার সামনের পাটির দাঁত দেখতে পেয়েছি। ঝলসানো ভুট্টার দানার মতন কালচে পোড়া পোড়া রঙের দাঁত। অবিশ্যিই হেসে দাঁত দেখায়নি, ওটা নিশ্চয় স্বভাবে বিকশিত। শরীরটি পুষ্ট না, তবে শক্ত আর খাড়া। ভুরু কুঁচকে তাকানোর মধ্যে বিরক্তি না মেজাজ খারাপের অভিব্যক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিংবা হতে পারে, ধুতি পাঞ্জাবী পরা, চোখে কালো কাঁচের চশমা পরা বাঙালীটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নেহাতই একটু কৌতূহলের ভ্রূকুটি মাত্র। আর কিছু না। না হলে

অমন মুখ ফিরিয়ে উদাস নির্বিকার ভাবে চলে যাবারই বা কারণ কী? এখন পর্যন্ত তো আমার মনের গতিবিধি তার জানবার কথা না।

অতএব, আমাকে আমার জায়গাতেই আবার দাঁড়াতে হলো। বুড়ি গিয়ে দাঁড়ালো গাছতলায় ইঁটের পাঁজা সাজানো স্তূপের ওপরে আধশোয়া মরদের সামনে। আমার না হয় এতক্ষণ মরদের ওপর নজর পড়েনি। সে কি একবারও আমাকে দেখেনি? সে কি মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর নিঃসঙ্গ পুরুষটির মতন চিরকাল ধরে দূরের দিকে ওইরকম করে তাকিয়ে বসে আছে? আর বিড়ি ফুঁকে যাচ্ছে?

অবিশ্যি মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর পুরুষটির চেহারার সঙ্গে গাছতলার মরদের চেহারার অনেক ফারাক। পঁচিশ তিরিশ আন্দাজ বয়সের মরদের গায়ের রঙ ভেজা গঙ্গা মাটির মতন। লম্বা হিলহিলে রোগা শরীরে এখন পেশিগুলো এলানো সাপের মতন দেখাচ্ছে। মাথার ছোট চুল উসকো খুসকো এবং কালো গোঁফজোড়া লম্বায় চওড়ায় তার কিছুটা লম্বা মুখের তুলনায় চোখে পড়ার মতন বড। তবে বুড়ির 'মরদ' সম্বোধনটি একশো এক ভাগ খাঁটি কারণ হাঁটুর ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত এক খণ্ড বস্ত্র ব্যতিরেকে গায়ে কিছুই নেই। ধন্য নেতার পুণ্য দেশ কী না জানি না, মাঘের শেষের আকাশের গোটাটাই নীল। আকাশের উত্তর পশ্চিম থেকে মাঝে মধ্যে দু এক টুকরো শাদা মেঘের গড়িমসি চালের চলনে বর্ষণের কিছুমাত্র ইঙ্গিত নেই। অবিশ্যি উত্তুরে হাওয়ার প্রাবল্য নেই বরং রোদে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে গায়ের জামা খুলে ফেলতে ইচ্ছা করে। অথচ চিরকাল শুনে এলাম মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে। তা বলে, জোয়ারের জল ছুঁই ছুঁই গাছের ছায়ায় একেবারে খালি গায়ে মরদের কি একটুও শীত করছে না? আর একটুকরো বস্ত্র তার মাথার কাছে এলোমেলো ছড়ানো পড়ে আছে। কম করে একশো হাত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি, তার পায়ে হাঁটুতেই কেবল নয়, গায়ের দু এক জায়গায়ও গঙ্গার কাদামাটির শুকনো দাগ।

বুড়ি গাছতলায় সাজানো ইঁটের পাঁজার সামনে দাঁড়িয়ে, কোমরের কাপড়ের কাছ থেকে কী একটা বের করলো, স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। মরদকে কিছু বললো। মরদ মুখ না ফিরিয়েই বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটা এগিয়ে দিল বুড়ির দিকে। বুড়ি জ্বলন্ত বিড়িটি ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে একটি বিড়ি নিজের ঠোঁটে চেপে ধরলে, আর জ্বলন্ত বিড়িটি ঠেকিয়ে, গাল চুপষে টেনে টেনে মুহূর্তেই ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই আবার ডান হাতে কোমরের কাপড়ের কষিতে কিছু গুঁজলো। বোধহয় বিড়ির কৌটো।

আমি নিজের অজান্তেই ঢোক গিললাম। কেবল চুল চুলকানি নয়, বুড়ির নেশাও পেয়েছিল। তার বিড়ি টানা দেখে আমার নেশাও যেন রক্তে খুঁচিয়ে দিল। কিন্তু ধূমপানের আগে আমি বুড়ি আর মরদের ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি। দেখছি, বুড়ি মরদকে তার বিড়িটি ফিরিয়ে দিল। ব্যাপার কী? মরদের কি ঘাড়ে ব্যথা? একবারও যে ফিরে তাকায় না। মুখ না ফিরিয়েই বিড়িটি নিল। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল। ধোঁয়া তেমন বেরুলো না। বুড়ি আবার কিছু বললো। মরদের ঠোঁট নড়তে দেখলাম না। বিড়িটা নিশ্চয় নিভে গিয়েছিল। সেটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে বসলো। মাথার কাছে রাখা বস্ত্র খণ্ডটি টেনে দু হাতে মেলে ধরতে বোঝা গেল, ওটি একটি চাদর বিশেষ। মরদের তা হলে শীত লাগছে, এবার গায়ে দেবে?

না, আমার অনুমান আর মরদের কর্ম, পরস্পরে অমিল। চাদরের মতন গেরিমাটি রঙের বস্ত্রটি একবার ঝাড়া দিয়ে কয়েকটা লম্বা ভাঁজ করে, মাথায় জড়িয়ে নিল। নেমে এলো ইঁটের পাঁজার ওপর থেকে। বুড়ি তার আপন মনে কিছু বলেই চলেছে আর বিড়ি টানতে টানতে মরদের পিছন ধরে নৌকার দিকে এগিয়ে চললো। মরদ না তাকালেও আমার উপায় নেই। আমিও ঢালুতে পা বাড়িয়ে একেবারে নৌকার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

মরদ এবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। বুড়িও এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো। দয়ার পাত্র আর কাকে বলে। চোখ থেকে কালো কাঁচের ঠুলিটা খুলে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মরদের দিকে তাকিয়ে বাঙলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি চরে যাবে ভাই?'

'হুঁ'। মরদ বেশ সহজভাবেই জবাব দিয়ে প্রায় পরিষ্কার বাঙলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আপনে কি হালিশহর যাইবেন, না হাজিনগর?'

বুড়ির কালচে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, কপালে জলের ঢেউ লাগা পাড়ের বাঁকা রেখা ফুটলো।

নাসারন্ধ্রে নির্গত ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে। মরদের মুখের ভাব, গলার স্বর, আশাতীত প্রসন্নতা। অন্তত এই মুহূর্তে আমার কাছে সেইরকমই মনে হলো। কারণ আমার আশঙ্কা ছিল কিছু জিজ্ঞাসা করা ভুল করেছি! মুখে হয়তো হাসি নেই, অচেনা লোককে অভ্যর্থনায়ও গদগদ নয়। তবে তার জিজ্ঞাসার মধ্যে অবাস্তবতা নেই। আমার জিজ্ঞাসার একটাই মানে তার কাছে, তার নৌকার যাত্রী হওয়ার একটা কারণই থাকতে পারে, আমি হালিশহর যাবো অথবা হাজিনগর। কাজের মানুষ কাজের কথা ভেবেই আওয়াজ দেয়। আমিই বরং একটু অপ্রস্তুত হেসে বললাম, 'না, ভাবছিলাম, তোমাদের সঙ্গে একটু চরে যাবো। খেয়া নৌকো তো ওখানে যায় না। দেখে মনে হলো তোমরা চরেই যাবে, তাই—।' কথাটা শেষ না করে আমি মরদের মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম।

মরদ যেন আরও সহজতর। এবার প্রায় অভ্যর্থনাই বলতে হবে, 'হুঁ হুঁ, হামিনলোগ তো চরেই যাইবেন। আপনে উঠিয়ে পড়েন না।'

আহা, বেঁচে থাকুক এমন বাঙলা ভাষা। এখন তো সাদর অভ্যর্থনাই বলতে হয়। মরদ খুঁটিতে বাঁধা দড়িটা ধরে নৌকা টেনে নিয়ে এলো। গলুই একেবারে ডাঙার ওপরে। পাটাতন নেই, পড়ে

যাবার ভয়। ছোট নৌকা। যে দিকে একটু ভার পড়বে সেদিকেই কাত হবে, তারপরে গঙ্গাস্নানটা অনায়াসেই ঘটে যেতে পারে। অতএব, গলার চাদর মুঠি পাকিয়ে ধরে সাবধানে গলুই বাঁচিয়ে প্রথম পা দিলাম খোলের ভিতরেই। আর এক পা বাড়াতে গিয়েই বুঝলাম, সমূহ বিপদ! মরদ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'বসিয়ে পড়েন, বসিয়ে বসিয়ে উঠেন।'

যথা সময়ে যথার্থ নির্দেশ। বাহাদুরি করে লাভ নেই। নীচু হয়ে নৌকার গলুই এক হাতে চেপে ধরে আর এক পা টেনে নিলাম। বসে পড়লাম খোলের মধ্যেই। ইতিমধ্যে বুড়ির মনে লেগে গিয়েছে ধন্দ। তার হিন্দি বুলি শোনাচ্ছে প্রায় বিদ্যাপতির ব্রজবুলির মতন। মরদকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবু কহাঁ যাওত হো?'

মরদ বাঁশের লগি টেনে তুলতে তুলতে দ্রুত কিছু বললো, বুঝতে পারলাম না। পিছন ফিরে দেখলাম, বুড়ি তার বিড়িতে শেষ টান দিয়ে শেষাংশ ছুঁড়ে ফেলে নীচু হয়ে দু হাত দিয়ে গলুই চেপে ধরলো। হামাগুড়ি দিয়ে নৌকায় উঠলো। তাকে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য আমাকে খানিকটা সরে যেতে হলো। মরদ লগি টেনে তুলে গলুইয়ের পাশ দিয়ে নৌকার খোলে ঢুকিয়ে দিল। বাঁ হাতে নৌকার দড়ি ধরা। উত্তরে ঘোরানো নৌকার মুখ, গলুই ঠেলে সোজা পূব মুখী করলো। তারপরে গলুইয়ে নীচু হয়ে নৌকা ঠেলে দিল জলে। নিজে বসে গেল গলুইয়ের দু ধারে দু পা ঝুলিয়ে। বাঁ দিক থেকে হাতে তুলে নিল বৈঠা। তারপরেই ধোয়া পা তুলে নিয়ে বৈঠার চাড়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল দক্ষিণ-পূব কোণে।

ব্যাপারটা ঘটলো যেন সহজেই। কিন্তু মরদের সারা শরীরে, পা, তলপেট, বুক আর দু হাতের পেশিগুলো যে-রকম সাপের মতন কিলবিলিয়ে উঠলো, দেখে বোঝা গেল, সহজের মূলে শক্তি। কথায় বলে ভাঁটার টান, কিন্তু জোয়ারের উজানের টানও কম না। উত্তরের টানকে পিছনে রেখে দক্ষিণ পূবের মুখে বৈঠা চালানো সহজ না। তবু

জলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে নৌকা যেন চলছে না। ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার দিকে তাকালে বোঝা যায়, নৌকা চরের দিকে একটু একটু এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যেই মরদ বললো, 'হাই বাবু, উধার গলুই পরে বসিয়ে যান না, আরাম হবে।'

আরামের চিন্তাটা মাথায় আসেনি, কিন্তু ছোট নৌকার ছোট খোলে উটকো হয়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল বিলক্ষণ। বুড়িও তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'হঁ বাবু, যা যা।'

মানুষ চিনি? কোনোদিন বলবো না পথে ঘাটে চলতে ফিরতে যাদের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ হয় না, এখন এই মাঝ দরিয়ায় কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝতে পারছি না। বোঝাবার অবশ্যি দরকার নেই। মানুষ না চিনলেও এখন বুঝতে পারছি, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশা এরা করে না। বুড়ির বস্তা ডিঙিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বিপরীত গলুইয়ে পৌঁছে সত্যি সত্যি পা ছড়িয়ে বসা গেল। তারপরেই প্রথম যে-কথাটা মনে পড়লো, সেটা হলো পারানির দক্ষিণা। তখন খেয়া নৌকার কথা তুলেছিলাম, কিন্তু চরে পৌঁছুবার দক্ষিণাটা কতো সেটা জিজ্ঞেস করিনি। দরকারও নেই। বরং গায়ের পশমী চাদরটা কোলের ওপর রেখে চোখে ঠুলি আঁটলাম। পকেট থেকে বের করলাম সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজতে গিয়ে নজর পড়ে গেল মরদের দিকে। মরদের নজর দক্ষিণে। জিজ্ঞেস করলাম, 'চলবে নাকি ভাই?'

হ্যাঁ, এখন ভাই বেরাদার অনেক কিছুই মুখে ফুটছে। অন্য সময় হলে, তুমি কার, কে তোমার। সংসারের নিয়ম ওটা। মরদ আমার দিকে তাকিয়ে বিস্ফারিত গোঁফে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, বললো, 'হঁ হঁ চলবে বাবু, আগে চরে চলেন।'

তা বটে। বেশি আত্মভোলা হয়ো না মন। বুঝে চলো। জোয়ারের স্রোত ঠেলে, যে-মাঝি দু হাতে বৈঠা টেনে চলেছে, তার

পক্ষে এখন আর কিছুই চলে না। কিন্তু বুড়ি আমার দিকে ফিরে তাকালো। দেখলাম, ভাঙাচোরা ভাঁজ মুখে, ঝলসানো ভুট্টা দানার দাঁতের হাসি। অনায়াসেই একটি হাত বাড়িয়ে বললো, 'হামে দে বাবা।'

আমি তাকালাম মরদের দিকে। মরদের মুখে হাসি, বললো, 'হু' নানীকে দেন বাবু।'

বুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে আমার সামনে এলো। আমি তার ময়লা খড়িওঠা হাতে সিগারেট দিলাম। সে একবার নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলো, বললো, 'বাবু মসশাই চিজ।'

আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। সে তাড়াতাড়ি মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে বললো, 'অবহি নহি, বাদ মে পিওব। তু আপনা দম লাগা বাবা।'

তাই ভালো। বুঝতে পারিনি, পাবার ব্যস্ততা আসলে ভবিষ্যতের সঞ্চয়। আমি আবার মরদের দিকে তাকালাম। না, তার নজর আর এদিকে নেই। লক্ষ্য দক্ষিণ পূবে, নৌকা ক্রমেই চরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি সিগারেট ধরালাম। বাতাস আটকে ধরাতে গিয়ে মুখ ফেরালাম। চোখে পড়লো হুগলির রেলপুলের অনেকখানি। নৌকায় উঠতে পারা আর চরে যাবার সংকট কেটে যাবার পরে নদীর বুকে সিগারেটের টানটা নতুন খুশির আমেজ এনে দিল। দক্ষিণ দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চরের দিকে তাকালাম।

'তু তু একেলা কাহেঁ যাওত বাবা? দোস্ত সাথী জরু লড়কা লেড়কি লে নহি আওত ক্যায়া?' বুড়ি জিজ্ঞেস করলো।

আমি বুড়ির দিকে তাকালাম। তার মর্মার্থ ধরতে পারলাম না। বন্ধুবান্ধব বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কেন আসিনি? একলা কেন? এতখানি আপ্যায়ন তো আশা করা যায় না। আমি অবাক হয়ে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তাদের নিয়ে আসবো কেন?'

'উ ত তুলোগ জানত হো বাবু।' বুড়ির ঝলসানো ভুট্টা দানা দাঁতের হাসির সঙ্গে চোখের চারপাশে এবার অনেকগুলি ভাঁজ পড়লো, 'বাবুলোগ আপনা নাও পর ঐসান আওত, চৌরে পরে খানা পাকারি খাওত, পিওত, দিনভর কতনি নাচা গানা করতহি—।'

বুড়ির কথার মর্মার্থ বুঝে নিয়েছিলাম। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই মরদ ওদিকের গলুই থেকে বলে উঠলো, 'ফিষ্টি বাবু, ফিস্টি করেন না আপনেরা ? চড়াইভাতি। নানী হোই কথা বলছে।'

সংবাদটা আমার কাছে নতুন। এতকাল ধরে কেবল হাতছানিটাই দেখে এসেছি আর মনে মনে ভেবেছি একদিন নদীর মাঝখানে সবুজ রেখাটিতে যাবো। তখন একবারের জন্যও এই চিন্তাটা মাথায় আসেনি আমার আগে, আমার মতন অনেক মানুষ হাতছানির সাড়া দিয়ে গিয়েছে একেবারে চর মাথায় করে। আমি খালি ভাবছি নিরিবিলি চরটি অনেক দূরে আপনাতে আপনি আছে অন্যদের চোখে তখন তার আর একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছে, 'পিকনিক স্পট'। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কখনো কখনো লোক পারাপার করতে দেখেছি। চর ডিঙিয়ে এপার ওপার। কিন্তু চড়ুইভাতির কথা কেউ কখনো বলেনি, তেমন কোনো দলকে নিজের চোখে ডাঙা থেকে ভেসে আসতেও দেখিনি। আমি মরদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চরে লোকেরা ওসব করতে আসে নাকি ?'

'হুঁ বাবু, কখুন কখুন আসে। এই জারা ঠাণ্ডার টাইমে ছুট্‌টির দিনে বাবুলোগ চড়াইভাতি করতে আসে।' মরদ বৈঠা টানতে টানতে বললো, 'তবে এই চরে কমতি আসে, তিরবেনীর চরে জায়দা যায়।'

ত্রিবেণীর চর আরও উত্তরে, সেটা এদিক থেকে বিশেষ চোখে পড়ে না। আমার চলাচলের পথে এই হালিশহরের চরটাই এতকাল চোখে পড়ে এসেছে। এখানে কম লোকে চড়ুইভাতি করতে আসে, এ সংবাদেও মনে কোনো সান্ত্বনা পেলাম না। লোকেরা এ চরে

চড়ুইভাতি করতে আসে, খবরটা আগে জানা থাকলে বোধহয় মনটা এমন বিমর্ষ হয়ে যেতো না। বিমর্ষ? একেই বলে মন গুণে ধন। রীতিমতো ঈর্ষাবোধ করছি। হিংসে যাকে বলে। যেন একান্ত আমারই ভোগের জন্য জেনে এক জায়গায় গিয়ে শুনি, সেখানে বহু-ভোজের মহোৎসব অনেক আগেই ঘটে গিয়েছে। নিজেকে কেমন বঞ্চিত মনে হতে লাগলো। তবে, দু পাড়ের মূল স্থলে এতকালের যাওয়া আসার সময়ে, জলে ভেসে থাকা সবুজ রেখাটির এত হাতখানি কিসের? ছলনা?

মুখ ফিরিয়ে চরের দিকে তাকালাম। এখনো অনেকটাই যেতে হবে। গাছ বলতে একটিই বেঁটে ঝাড়ালো গাছ দেখতে পাচ্ছি উত্তর দিক ঘেঁষে। তার পাশেই গায়ে গায়ে লাগানো দুটো খড়ের দোচালা চালা ঘরের চাল মাটি ছুঁয়েছে। বাকিটা সবই সবুজ, আর কোনো রঙ চোখে পড়ে না। হাতে একটি সরু লম্বা কঞ্চি নিয়ে চরের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে চলেছে যে, তার দুটো ছোট হাত আর একটি ছোট মাথা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আরও দু একটি মূর্তি দূরের উত্তরে চোখে পড়ছে।

আশ্চর্য! এ আমার চোখের ধন্দ নাকি? এখনো সেই একই হাতছানি দেখতে পাচ্ছি। এখনো তেমনি নিরালা আর রহস্য দিয়ে ঘেরা চর, মনটাকে যেন আগের মতনই টানছে। এও কি ছলনা? আমি মুখ ফিরিয়ে মরদের দিকে তাকালাম। সে চরের দিকে তাকিয়ে উজানের স্রোত ঠেলছে। বুড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই সব লোকজন এলে তোমাদের বেশ ভালো লাগে, না?'

বুড়ি আমার কথাটা তেমন বুঝে উঠতে পারলো না। ভুরু কুঁচকে বললো, 'কা কহল বানি বাবা?'

জবাব দিল মরদ, 'না না বাবু, হামিনলোগের আচ্ছা লাগে না' বাবুলোগ জেনানা উনানা বালবাচ্ছা সব লিয়ে আসে, ফেক্তি উতি

পর লড় দৌড় করে। আমরা এই লায়ে পর শহর থেকে আলিফ করে কলের পানি লিয়ে আসি, লকরি লিয়ে আসি, উসব মাংগে। ও কি বলব বাবু, না দিলে উনলোগ গোসা করে, আর হামিনলোগকে খানা বাঁচলে খেতে বোলায়।' কথাটা বলে সে হাসলো আর মুখ ফিরিয়ে নিল।

তার হাসি আর মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা যেন বিশেষ অর্থবহ। অবিশ্যি তার থেকে অনেক বেশি অর্থবহ তার কথাগুলো। কেমন একটা অসম্মানবোধ আর ক্ষোভের সুর যেন বাজলো তার কথায়। আমাদের বাঙালী 'বাবুলোগ'দের মনোভাবটা আমার না জানার কথা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে চেহারা, জীবনযাপনের ছবির সঙ্গে আমাদের চোখে যারা 'গরীব' তাদের কতোটুকুই বা আমরা চিনি। মরদের অসম্মানবোধটা স্পষ্ট...'বাবুদের বনভোজনের খাবার বাঁচলে আমাদের খেতে ডাকে।' দ্বীপের মরদরা যে তা খেতে যায় না, তার কথা থকেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু 'বাবুলোগ'-দের খেতে ডাকাটা যে তাদের কতোখানি অসম্মানিত করে, বাবুদের সে-ধারণাটাও নেই। তা ছাড়া চাষ-আবাদের জমিতে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি ক্ষতির কারণ। বেচারিরা নৌকায় করে শহরের জলকল থেকে জল নিয়ে আসে, রান্নার আগুনের জন্য কাঠকুটো নিয়ে আসে। বাবুবনভোজনওয়ালারা তা অনায়াসেই দাবী করে। ক্ষোভের কারণ সে-গুলোই। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে মুখ ফেরানোর কারণটা কী?

কথাটা জিজ্ঞেস করার বিষয় না। অনুমান করে নিতে পারি। হাসিটা তার সংকোচ আর লজ্জার। কথাগুলো শোনাচ্ছে সে 'বাবুলোগ'দেরই একজনকে। বাবু আবার কী ভেবে বসেন, কে জানে? ভাবলেও হয়তো তার কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এটা হলো মরদের নিজস্ব ভদ্রতা। এ মানুষগুলোর মানসিকতা এমন জটিল না, যা বুঝতে হলে 'ভদ্রলোক'-দের বিস্তর প্যাঁচপয়জার জানা

থাকা দরকার। এখন আমার মনেই কেমন একটা খচখচানি। মরদ যেমন অনায়াসেই তার নৌকায় আমাকে সওয়ার করে নিল, তারপরে আমার সিগারেট দিতে চাওয়ার ব্যাপারে সে মনে মনে হাসেনি তো?

তাই যদি হবে, তবে বুড়ি অমন হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল কেন? বড় বেশি ব্যস্ততাই তো দেখেছিলাম। ভিখিরিপনা না থাকলেও, লোভ দেখেছিলাম। আসলে বুড়ির পক্ষে ওটাই সহজ। ওটা ভীমরতি না, মৌতাতের টান। খাবার আর নেশার বস্তুতে তফাত আছে। একটা নিতান্ত স্থূল, আর একটা রসের ব্যাপার। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় না বুড়ির আত্মসম্মানবোধ নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে মরদ আমার মনে খটকা ধরিয়ে দিল। খটকা না বলে অবাক করা বলা চলে। গঙ্গা মায়ীর বুকে বাস করে শহরের জলকলের পানী কেন নৌকায় করে বহে নিয়ে আসতে হয়? অনেক বাঙালী মাঝির কথা জানি, যারা গঙ্গার বুকে মাসের পর মাস বাস করে, তারাও অনেকেই গঙ্গার পুণ্য সলিল পানেই তৃষ্ণা মিটিয়ে থাকে। মাঝি তো অনেক দূরের কথা, আমার বিধবা মা থেকে বর্ষীয়সী বিধবা আত্মীয়রা অনেকেই এখনো গঙ্গাজল পেলে কলের জল স্পর্শ করতে চান না। গঙ্গার পুণ্য সলিল যে আর পবিত্র নেই, দুপাশের কল-কারখানার বিষাক্ত তরল কেমিক্যাল, শহরের খালের মতন বিরাট নর্দমার মুখ দিয়ে যতো রকমের নোংরা আর ময়লা বারো মাস এসে মিশছে, যা অনেক সময় স্রোতের জলে চাক্ষুষ ভাসতে দেখলে গা ঘিন ঘিন করে, গা ডুবিয়ে স্নান করতেও প্রবৃত্তি হয় না, সে-কথা বলেও তাঁদের নিবৃত্ত করা যায় না। অথচ নদীর বুকে চরায় যারা বাস করে, চাষ করে, তাদের গঙ্গামায়ীর পবিত্র পানীতে এহেন বিরাগ কেন? মরদের মতন মানুষের কাছে গঙ্গার জল সম্পর্কে এতোটা স্বাস্থ্যকর 'দৃষ্টিভঙ্গি' আশা করিনি। না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'তোমরা গঙ্গার পানী খাও না?'

মরদ বৈঠা টানতে টানতে জবাব দিল 'হুঁ বাবু, হামিন-লোক সবহিরকম পানী পীওতবানী, কিন্তু আদমীলোগ কুছু মানে না। গঙ্গাপানী বিলকুল গন্ধা করিয়ে দিচ্ছে। ই দেখেন না, উজানিয়া টাইমে হাজিনগরের কাগজ কলের বহুত গর্দা ভাসাইছে। যিতনা ইঁটের ভাটা আছে কিনা বাবু, সব গঙ্গা কিনার কিনার বিশ পঁচিশ টাটটিখানা বানাইছে। কেততো মুর্দা জলে ভাসিয়ে যায়। বিমার উমার হলে ডগদরবাবুর কাছে যাই, ত ডগদরবাবু বলেন কি গঙ্গাপানী পীনা বিলকুল বন্ধ না করলে বিমার খোবে না। ত হুঁ খানাউনা সবহি গঙ্গাপানীতে পাকাই, আর হর টাইম কলের পানী থাকে না, তখুন ত গঙ্গাপানী পীয়ে যাই।'

আমরা জলও খাই, মরদরা পীয়ে। যাই হোক, আসল কথাটা বোঝা গেল। চরে বাস বলেই গঙ্গার জলের নোংরা ময়লা, মৃতদেহও মরদেরা সব সময়েই চোখে দেখতে পায়। বিরাগটা সেই কারণেই। তা ছাড়া ডগদরবাবুর মানা আছে, বিমার সারবে না। তবুও এমন নয় যে গঙ্গার পানী পান একেবারেই চলে না। কলের জল সবসময়ে মজুদ থাকে না। রাখাও বোধহয় সম্ভব না। মোদ্দা কথা কলের জল না হলেও চলে যায়। তবে রাখতে পারলে ভালো।

খুবই ভালো। চরে গিয়ে তেষ্টা পেলে তাহলে আমাকে পুণ্য সলিলে তা মেটাতে হবে না। আমি তো আর বনভোজনের দল নিয়ে আসিনি। কাঁধে করে নিয়ে আসিনি জলের পাত্রও। একলা মানুষ, একটু জল চাইলে মরদ বা তার পরিবারের লোকেরা নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে না।

'বাবু, হুসিয়ার।' মরদ আওয়াজ দিল, 'লাও ঘাটেপর লাগছে।'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি উঁচু পাড় সামনে। হুসিয়ার না করলে ধাক্কা লাগবার সম্ভাবনা ছিল। গলুইটা দু হাতে জোরে চেপে ধরলাম। নৌকার গলুই ঠেকলো চরের ডাঙায়। ভেবেছিলাম,

কিছুটা সমতল বালুচরে নৌকা লাগবে। ভুলে গিয়েছিলাম, এখন জোয়ারের ভরা ভরতি। তবে মরদ ঘাটেই নৌকা লাগিয়েছে। দেখা গেল, শক্ত মাটির উঁচু পাড়ে সিঁড়ির মতন কয়েকটি ধাপ কাটা। এক ধরনের বুনো গুল্ম লতা মাটির বুকে ছড়িয়ে আছে।

ধাক্কাটা লাগলো মোটামুটি জোরেই। কিংকর্তব্য ভেবে কিছু করবার আগেই মরদ বিপরীত দিকের গলুই থেকে লহমায় এগিয়ে এসে লাফ দিয়ে নামলো ডাঙায়। হাতে সেই বাঁশের লগি। এদিকের গলুইয়েও একটি লোহার আংটায় দড়ি ছিল। সেই দড়িটা টেনে ধরে বললো, 'নামিয়ে পড়েন বাবু।'

এর থেকে সুবিধা আর হয় না। জল কাদা কিছু নেই। স্যাণ্ডেল পায়ে দিব্বি ডাঙায় নেমে পড়লাম। বুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে তার বস্তাটা টেনে নিয়ে এলো গলুইয়ের কাছে। অনায়াসেই সেটা মাথায় তুলে পাড়ে নামলো। কোনোদিকে না তাকিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেল ওপরে। মরদ তখন লগির গায়ে দড়ি বেঁধে সেটাকে মাটিতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেকখানি গভীরে ঢুকিয়ে দিল। নাড়াচাড়া করে দেখলো, লগি বেশ শক্তভাবেই গেঁথে বসেছে। তারপরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো, 'উঠিয়ে যান বাবু, ঘুম উসকে দেখেন।'

মরদ কথাগুলো বলে আমার আগেই ধাপের পাশ দিয়ে এক দৌড়ে লাফিয়ে উঠে গেল। আমি মাটি কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবলাম, এখন জলের বুকে কুমিরের পিঠে আছি। মরবার ভয় নেই বটে, ইচ্ছা মত্যো যখন খুশি পশ্চিমের মূল ডাঙায় ফিরে যেতে পারবো না। সেই আবার মরদকেই হয়তো বলতে হবে। অথবা তারা যখন কেউ যাবে, তখন নৌকায় ঠাঁই নিতে হবে। ওপরে উঠে দেখছি, মরদ চলেছে চালাঘরের দিকে, বুড়ি বস্তা মাথায় চলেছে তার আগে আগে। আমি ডাক দিলাম, 'এই যে ভাই শুনছো?'

মরদ দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো, হুঁ। আমি সঙ্কোচে হেসে বললাম,

'তোমার নৌকায় নিয়ে এলে পারানির পয়সাটা নেবে না?' কথাটা যেন বুঝতে পারেনি এমন অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে তাকালো। তারপর চর কাঁপিয়ে হেসে উঠে বললো, 'হায় রাম। আমি কি বাবু ঘাটমাঝি আছি? আমার লাওয়ে পর আপনেকে লিয়ে আসলাম, এতে পারহানি কী দিবেন? আপনে চর দেখতে আসিয়েছেন, দেখেন না।'

মরদের হাসি আর কথায় একটু যেন নিভেই গেলাম। কিন্তু মনটা কেমন ঝরঝরিয়ে গেল। সহজ ভাবের ব্যাপারটা সহজে কোনোদিন বুঝতে পারলাম না। আমি নিজের কাজ গোছাবার জন্য প্রথম থেকেই ভাব জমাবার চেষ্টা করে আসছি। মরদ সেরকম কোনো চেষ্টা না করেই, নিতান্ত মামুলিভাবে আমাকে তার নৌকায় নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, 'এবার তা হলে সিগারেটটা নাও।'

মরদ কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললো, 'দেন।'

আমি পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট তাকে দিলাম। সে সিগারেটটা কপালে ঠেকিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলো। আমি দেশলাই দিলাম। সে কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটে ছোঁয়ালো। টান দিল একটা লম্বা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফিরিয়ে দিল দেশলাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নামটা কী ভাই?'

'ভরত।' মরদ জবাব দিল, সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো।

এখন দেখছি ভরত নামে মরদের অবয়বটা যেন পালটে গিয়েছে। তার লম্বা ছিলছিলে শরীরটা জুড়ে যেন সাপ জড়ানো। আসলে বৈঠা টেনে তার পেশিগুলো এখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সারা গা ঘামে ভেজা, যেন তেল চকচক করছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই বুড়ি তোমার কে হয়?'

'নানী।' ভরতের নাসারন্ধ্র দিয়ে লম্বা চওড়া গোঁফ জোড়ায় যেন

সিগারেটের ধোঁয়া ঢুকে গেল, 'সমঝলেন কি বাবু? ঠাকরান নাই, নানী মায়ের মা যে আছে, ওহিকে নানী বোলে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর ঠাকরান?'

'বাবার মা।' ভরত আবার সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'ত আপনে চরে ঘুমেন বাবু, আমি ঘরে যাই।'

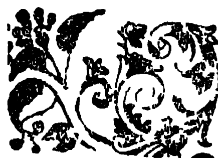
আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও।'

ভরত ফিরে চললো চালার দিকে। তার নানীকে আর দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় চালায় ঢুকে পড়েছে। দূরের থেকে এতোদিন দেখে এসেছি একটা কিংবা দুটো চালা ঘর। এমন কি একটু আগে নৌকায় বসেও গায়ে গায়ে লাগালাগি দোচালা ধারের দুটো চালাঘর যেন দেখেছিলাম। এখন সামনে থেকে দেখছি, ভুল দেখেছি। দুই না, চার পাঁচটি ঘরের কম না। মুখোমুখি আর গায়ে গায়ে ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে যেন একটি সরু রাস্তাও দেখছি। প্রায় একটি পাড়া। কতো লোক থাকে?

যে গাছটাকে ভেবেছিলাম ঝাড়ালো বেঁটে, সেটি ঝাড়ালোও বটে, বেঁটেও বটে, তবে আসল গাছটি আদৌ প্রাচীন না। অথচ। অথচ কেন যেন মনে হয়েছিল ঝাড়ালো বেঁটে হলেও গাছটি বট অশ্বত্থ জাতীয় কিছু হবে। এখন দেখছি গাম্বিল বা সেই জাতীয় কোনো গাছ। বোঝা উচিত ছিল, এই চরে এখনো কোনো বৃক্ষেরই প্রবীণ হয়ে ওঠা সম্ভব না। দূর থেকে এতদিন দেখে এসেছি, চালাঘর চরের উত্তর সীমায়। আসলে উত্তর ঘেঁষে কিন্তু চালা ঘরগুলো ছাড়িয়েও চরের সীমানা উত্তরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। সেই দিকেও শস্যের সবুজ আভা।

আমি মুখ তুলে হালিশহরের দিকে দেখলাম। বালির ঢিবি, প্রায় সারবন্দী ঘর, কোথাও গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পাকা বাড়ি, দু একটা মন্দির, সেই বিখ্যাত পার্ক যার উলটো দিকেই হালিশহর পৌরগৃহ,

উঁকি দিচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি। দেখতে না পেলেও, বহুবার যাতায়াতের, রামপ্রসাদের ভিটার, পূর্বগামী পথটা চোখের সামনে ভাসছে। পশ্চিম পারে চোখ ফেরালেই, এক দিকে ডানলপ কারখানার কুঠি, কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ঘেঁষে। দক্ষিণে অনেকটাই হালিশহরের মতনই। গাছপালা. ঘরবাড়ি, নদীর ধারে ধারে ইঁট কাঠ চুন শুরকির গোলা। সব থেকে উঁচুতে মাথা তুলে আছে বাঁশবেড়ে হংসেশ্বরীর মন্দিরের চূড়া। তবে হালিশহরে কখনো পুরনো লোহালক্কড়ের স্তূপ দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। চোখ তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। চোখে কালো ঠুলি না থাকলে, রোদ ঝলকানো মাঘের নীল আকাশে চোখ রাখা সম্ভব ছিল না। বাঁ হাতের পাঞ্জাবীর হাতা সরিয়ে দেখলাম. ঘড়ির কাঁটা একটা বেজে এগিয়ে গিয়েছে কয়েক মিনিট।



অবশেষে সেই চরে, হাতছানির সাড়া দিয়ে। ঘর আছে, মানুষ আছে দেখতে পাচ্ছি, কিছুটা দূরেই মেয়ে পুরুষ কয়েকজন চরের মাঠে কাজ করছে অথচ যেমনটি দূর থেকে ভেবেছিলাম, অবিকল সেইরকম মিলে যাচ্ছে। স্থির বটে তথাপি যেন স্রোতের দিকে চোখ রেখে মনে হয় সবুজ দীর্ঘ একটি ভূমিরেখা নিরিবিলি মনের সুখে ভেসে যাচ্ছে। এই ভেসে যাওয়াটা দূর থেকে তেমন বোঝা যায় না। জোয়ারের উজান টান দেখলে, মনে হয়, চর এখন ভেসে চলেছে বিপরীতে, সমুদ্রের দিকে। ভাটার সময় নিশ্চয় চরকে উত্তরগামী ভেসে যেতে দেখা যাবে। মাঝে মাঝে চড়াইয়ের ঝাঁক উড়ে চলেছে। চরের কোনো জায়গায় দল বেঁধে বসছে, আবার উড়ছে। আর কোনো পাখি চোখে পড়ছে না।

আমার চোখের সামনেই, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছোলার চাষ হয়েছে। সবুজের ঝাড়ে ফসল এখনো অঙ্কুরের দশায়। ছোলা চাষের সীমানা পেরিয়ে, কিছুটা উত্তরের মাঝামাঝি এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, দুজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষ কাজে ব্যস্ত। চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকবো ভেবেও, পারলাম না। ছোলা খেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম দক্ষিণে। কয়েক পা এগোতেই, কে যেন আমার পাশ কাটিয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেল। দেখলাম, ছোটখাটো, নেংটি পরা চার পাঁচ বছরের এক বালক। হাতে একখানি লম্বা কঞ্চি। এ মূর্তির মাথা আর লম্বা কঞ্চি নৌকো থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। জানি না, বালকটির হাতে বাঁশের কঞ্চি কোথা থেকে এলো। এ চরে বাঁশের ঝাড় কবে জন্মাবে, সে-কথা একমাত্র চরের সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারে।

বালকটি ছুটে গিয়ে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকালো। নেংটিটা নিতান্ত নেংটিই। কোমরে এক প্রস্থ মোটা সুতো জড়ানো। তার সামনে পিছনে এক ফালি কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে সভ্যতা রক্ষা করা হয়েছে। কী দরকার ছিল জানি না। শহরের পথে ঘাটে ওর মতন ছেলেরা অসংকোচে দিগম্বর হয়ে ঘোরে। আর ও তো শহর থেকে অনেক দূরে। তবে এই শিশুর নেংটি বোধহয় শহুরে সভ্যতার থেকে মানুষের সহবতের কারণেই। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সারা গায়ে ধুলো কাদার দাগ। গলায় একটা কালো সুতোয় মাদুলি ঝুলছে। মাথায় খোঁচা খোঁচা কদম ছাঁট চুল। ওর অপলক অবাক কৌতূহলিত চোখে যদি কাজল না মাখানো থাকে, তাহলে বলতে হবে, ওর কাজল-কালো চোখ দুটি ডাগর। নাকটি টিকলো। ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গিয়েছে, দুধের দাঁত দেখা যাচ্ছে।

শিশু দাঁড়িয়ে দেখছিল চরের বুকে নয়া আদমিকে। কিন্তু নয়া আদমি দাঁড়ায়নি। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি, আর শিশু

আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, মুখ না ফিরিয়েই পিছু হটছে। পালতে বালিতে মেশামিশি এ মাটি এখন শক্ত হলেও, আছাড় খেলে চোট লাগার সম্ভাবনা তেমন নেই। চোখের কালো ঠুলি মানেই মুখোশ। শিশু আমাব আপাদমস্তকের থেকে, চোখের দিকেই দেখছে বেশি। একবার ভাবলাম, ওকে ছুটে গিয়ে ধরি। কথাটা ভাবতেই মনে মনে হাসি পেয়ে গেল। অকারণ বেচারিকে নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দেওয়া হবে। তবে ওকে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে কিছু ভুল করি নি। কৃষ্ণ তো ও বটেই আর দ্বীপের অধিবাসীকেই দ্বৈপায়ন বলে। স্বয়ং ব্যাসদেবকে নিয়ে অনেককাল একটা ভুল ধারণা ছিল, দ্বীপে যার জন্ম হয়, তাকেই দ্বৈপায়ন বলা হয়। প্রকৃত কথাটা জানলাম এই সেদিনে, স্বয়ং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের এক রচনায়।

গোলে হরিবোলে জানা একরকম, অনুশীলিত জ্ঞানেব বচন আলাদা। অতএব শিশুটিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলা বোধহয় অসঙ্গত হলো না। আমি ওকে তাড়া না করে, যাকে বলে 'বাজারি' হিন্দি, সেই ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমকো নাম ক্যায়া হ্যায় বেটা?

আর যাবে কোথায়? যেন তীরবিদ্ধ হরিণ বাচ্চার মতন একটা লাফ দিয়ে, কঞ্চিটাকে উঁচুতে তুলে, দৌড়ে একেবারে সেই দুই স্ত্রীলোক ও এক পুরুষের কাছে, কিছুটা উত্তরের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালো। কিছু একটা বললো নিশ্চয়। কারণ কর্মরত স্ত্রী পুরুষ তিন জনেই মুখ তুলে একবার আমার দিকে দেখলো। কিন্তু তাদেব অন্যদিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ যেন নেই। আবার মুখ নামিয়ে নিজেদের কাজ করতে করতে, যেন কিছু বলাবলি করতে লাগলো।

আমি ছোলার সীমানা পেরিয়ে, এগিয়ে গেলাম তাদের দিকেই। সাবধানে যেতে হচ্ছে। আমার আশেপাশে, এখনো দেখছি বেশ বিলিতি বেগুনের গাছে, লাল বিলিতি বেগুন ঝুলছে। যতোটা বালি আশা করেছিলাম, মাঝখানের ভূমিতে ততোটা নেই। এবড়ো খেবড়ো

মাটি আরও এগিয়ে গিয়ে, কাজের মানুষদের সামনে দাঁড়াতেই, কঞ্চি হাতে শিশু একটি স্ত্রীলোকের পিছনে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়ালো। ও বোধহয় ভেবেছে, আমার লক্ষ্য ওর দিকেই। আমি ওর কাছে ভিনদেশী তো বটেই। অন্যে আর নয়াও বটে, পোষাকে আশাকে, সবদিক থেকেই।

স্ত্রীলোকটি একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। তার ঠোঁটের কোণে হাসি। নিতান্ত স্ত্রীলোক বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? ছিপছিপে গড়ন, বলিষ্ঠ শরীরের যোবতী বহুড়ি বললেই যথার্থ বোঝায়। এর চোখ জোড়াও দেখছি, প্রায় কাজল মাখানো কালো, যদিও কাজল লাগায়নি। নাকটিও টিকলো। গায়ের রঙ দেখে, ঘন সবুজ কাঁটাল পাতার ছবি ভেসে উঠছে। অথচ কালো বলতে ইচ্ছা করে না। আর প্রায় সেইরকম রঙেরই একটি শাড়ির আঁচল ডান কাঁধ ঘিরে মাথার অংশও ঢেকে, কোমরে জড়ানো। আঁচলের ডাইনে বাঁয়েই বাঙালী অবাঙালীর পরিচয়ের চিহ্ন। অথচ দু হাতে দেখছি, বাঙালী সধবাদের মতন দুগাছি শাঁখা আর নোয়া, যা টেনে খানিক ওপরে তোলা। গলায় চিকচিক করছে বোধহয় রূপোর একটি সরু হার। অলংকারের মধ্যে আর কিছু নেই। মাথার ঘোমটা সরানো বলেই, সিঁথির সিঁদুরের রেখা চোখে পড়ছে। কপালে টিপ ছাপ কিছু নেই। হাতে পায়ে ধুলা, মুখে ভুরুতে চোখের পাতায় আর মাথার চুলেও ধুলো রেণু। তিন জনেই আলু তুলছে।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স, খালি গা চওড়া শক্ত পোক্ত গঠন পুরুষটির কাঁচা পাকা গোঁফ জোড়ায় ধুলা লেগেছে। হাঁটুর ওপরে তোলা, গঙ্গার জলে ধোয়া কিছুটা গেরিমাটি রঙের ছোট ধুতি। তার মাথার কদম ছাঁট চুলে আর বুকের মাঝখানে গুচ্ছের লোমেও ধুলা লেগেছে। মাথার টিকি গাছা তেমন বড় না। সারবন্দী আলুগাছের গোড়ায় কোদালের কোপ বসাচ্ছে, আর বাঁজিয়ে চাড় দিয়ে শিকড়ে

ঝোলানো ছোট বড় আলুর গোছা তুলে দিচ্ছে। এই পর্যন্ত তার কাজ। বাকি কাজ যৌবতী বহুড়ি আর প্রায় মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটির। মাঝবয়সী বলছি বটে, কিন্তু অনেক দিনের পুরনো রঙ উঠে যাওয়া আবছা লাল ডুরে শাড়িটি যৌবতী বহুড়ির মতনই পরা। চুল একটিও পাকেনি, সিঁথির মাঝখানে সিঁদুর। শরীরের দিক থেকে তাকেও বলিষ্ঠ বলতে হবে। কিন্তু শাঁখার বদলে দেখছি তার দু হাতে কাঁসার মোটা বালা। কানে মাকড়ি দুটোও রূপোরই মনে হচ্ছে। দুই রমণীর কাজ হচ্ছে, হাতের ছুরি দিয়ে, গাছের গোড়া কেটে, মাটি ঝেড়ে আলু বস্তায় ঢোকানো। তার মধ্যেই দ্রুত হাতে, আলু গাছের ডগার কয়েকটি কচি পাতা যা পাওয়া যাচ্ছে, কেটে ছেঁটে আলাদা করে রাখা। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে।

কোদালির কোপে ধুলো উড়ছে, ছোট ছোট গাছগুলোর গোড়া ধরে মাটি ঝাড়তে ধুলা উড়ছে। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে প্রথমে যৌবতী বহুড়ির পিছনে আত্মগোপন, আর বহুড়ির মুখ তুলে তাকানো, ঠোঁটের কোণে হাসি। তারপরে বাকি দুজনেও আমার দিকে একবার মুখ তুলে তাকালো। পুরুষটি আমাকে অবাক করে দিয়ে, হঠাৎ ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলো, 'রাম রাম বাবু।'

বলেই যে-ভাবে আবার নিজের কাজে লেগে গেল, মনে লাগিয়ে দিল খটকা। তার নিজস্ব নমস্কারের অভিবাদন কি আমাকেই? বুঝতে সময় গেল কয়েক মুহূর্ত, তারপরে আমি প্রায় হকচকিয়ে জবাব দিলাম, 'রাম রাম।'

কিন্তু তখন আর পুরুষটির তাকিয়ে দেখবার সময় নেই। বা নতুন করে আর আমার প্রতি নমস্কারের জবাব দেবার প্রয়োজন নেই। সে তার স্বভাবসুলভ অনাড়ম্বর নমস্কারটি জানিয়ে দিয়েছে, চরে আসা আগন্তুক 'বাবুটিকে।' বাবুই বরং অপ্রত্যাশিত নমস্কারে বিভ্রান্ত আর অপ্রস্তুত। কিন্তু বিস্ময়ের গুঞ্জনটা এখনো আমার মস্তিষ্কে পাক খাচ্ছে।

কাজের মানুষ কাজ ভোলে না। সহজ মানুষ সহজে চলে অনায়াসে। অথচ যেন ফল্গুধারার মতন। বাইরে দেখছো শুষ্কং কাষ্ঠং, অন্তঃস্রোতে বইছে আপন বেগে। ভরতের ক্ষেত্রেও এমনটিই দেখেছি।

এরকম অবস্থায় কথাবার্তা চালানো যায় না। বাক্যালাপের ব্যগ্রতা আমারও নেই। এই চরে আমি কথা বলতে আসি নি। এসেছি অনেকদিনের হাতছানির সাড়া দিয়ে, নিরালা চরের সঙ্গে নিরিবিলি হতে। মানুষ যে আছে, তা আগেই দূর থেকে দেখেছি। নিরালা চরেরই অংশ তারা। তাদের আলাদা করে দেখা যায় না।

অনেকদিন মনে মনে ভেবেছি, গঙ্গার মাঝখানের চরে কী ফসল ফলে? আজ চোখে দেখতে পেলাম ছোলার চাষ। আনাজের মধ্যে দেখছি, লাল টসটসে বিলিতিবেগুন, বাজারে যার চলতি নাম টম্যাটো। অথবা বলো, টমাটার। চরের এই মানুষরাও বোধহয় বিলিতি বেগুনকে বিলাইতি বাইগন বলতে ভুলে গিয়েছে। ছোলা টম্যাটোতে অবাক হই নি। কিন্তু এ চরের মাটি আলু প্রসব করে, চোখে দেখেও যেন অবাক লাগছে।

অবশ্য বাজারের নৈনিতাল আলুর মতন এর চেহারা না। অথচ, যাকে বলে ঠিকরে আলু, ঠিক যেন তেমনও না। জাতের দিক থেকে নৈনিতালের কাছাকাছি, আকৃতি কিছু ছোট, রঙটাও বর্ষায় ভেসে আসা লাল পলির ছোপ। আরও উত্তরের আশেপাশে দেখছি, এখনও ফুল আর বাঁধাকপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে, অনেক ফাঁকা। ফুলকপিগুলো বিশেষ করে তার সময়কালের রূপ হারিয়েছে। পাতার বাহার যদি বা আছে, ফুলের বাহার মোটেই নেই। সেই তুলনায় বাঁধাগুলো এখনও যেন বেশ আঁটসাট বড়সড় শরীরে রোদে ঝিলিক দিচ্ছে। দেখে বুঝতে পারছি, ফুল আর বাঁধার ফাঁকে ফাঁকে জমিতে, ছোট ছোট সবুজের চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। নিশ্চয়ই কোনো শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর নাম জমি। তাও

আবার অকূলের ভাসমান জমি। এক চিলতে পতিত রাখলে, জীবনও পতিত, না হলে আর মূল ছেড়ে, নদীর বুকে ?

কিন্তু চাষ যার জমি তার, এমন ঢক্কানিনাদ শুনে শুনে কানের পর্দা ফেটেছে অনেককাল, কাজে কখনো কিছু হতে দেখি নি। 'নেপো' বলে এক শ্রেণী বরাবর দই মারে বলে জানি। এই জমিব খাজনা নজরানার দাবীদার কে ?

জানতে ইচ্ছা করলেও, এই কাজের মানুষদেব এখন সেই কথা জিজ্ঞেস করতে মনে ঠেক লাগছে। দেখছি, শিশুটি এখনও যোবতী বহুড়ির পিছন থেকে, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আমার দিকে দেখছে। চোখাচোখি হলেই ঝপ করে মুখ আড়াল করছে। ভয় কেটেছে, এখন এটা লুকোচুরি খেলা চলছে। ইতিমধ্যে, ফুল, বাঁধা, ছোট ছোট সবুজ চারার সীমানা ছাড়িয়ে, আমার নজর এগিয়ে গিয়েছে আরও উত্তরে। সেখানে আরও দুটি মূর্তি কোনো কাজে ব্যস্ত। দূবত্বটা কম, অতএব, ফারাকে ফারাকে মূর্তি দুটি দেখে বুঝতে পাবছি, দুজনেই কিশোর কিশোরী। আরও উত্তরে, চরের উত্তর প্রান্তের শেষ সীমানায় একটি চালা ঘর দেখতে পাচ্ছি। একটি কালো মূর্তিকে দেখছি, পুবের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এসেছি যখন, কোনো সীমানাই বাদ দেবো না। তবু আগে উত্তরে পা বাড়ালাম। আমার পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিও ঘুরে যোবতী বহুড়ির কোমর জড়িয়ে তার সামনে গা ঢাকা দিল। কেন না, আমি যে এখন পিছনে। আমার কানে বামা স্বর এলো, বাবু তুহকে খা লেব ক্যায় ?

মাঝবয়সী না যোবতী, কোন বহুড়ী বললো, বুঝতে পারলাম না কিন্তু দোতারার নীচু পর্দায় ঝংকারের মতন রমণী স্বরের হাসি শুনতে পেলাম, তারপরেই, হট, হাত ছোড়।

আমি পিছন ফিরে একবার দেখলাম। যোবতী বহুড়ি শিশুটির হাত

ধরে কোলের কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। নেংটি পরা নেংটিটার কালো ডাগর চোখের দৃষ্টি আমার দিকে। এদের কার কী সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু যৌবতী বহুড়ি আর নেংটিটাকে মা ব্যাটা বলে মনে হচ্ছে।

আমি এবার কিছুটা ডান দিকে গিয়ে, উত্তরমুখী হলাম। তার আগেই নজরে পড়ল, জোয়ার থাকা সত্ত্বেও, চরের এদিকে ঢালুর নীচে খানিকটা বালুচর জেগে রয়েছে। জোয়াধের জল নিশ্চয়ই এদিকে নিজের মতলবে উজানের টানে জল কম ভাসায়নি। আসলে, এদিকে চর বোধহয় আরও বাড়তির দিকে। কিছুটা উত্তরে গিয়ে দেখি, মটর-শুটি এখনও চর থেকে বিদায় নেয়নি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার সীমানা। পশ্চিমের ধার ঘেঁষে, খালি গা, হাঁটুর ওপর ধুতি পরে ষোল বছরের একটি ছেলে, আর বছর দশেকের একটি মেয়ে, মাঝামাঝি জায়গায় নীচু হয়ে, ছোট ঝুড়িতে মটরশুটি তুলছে। মেয়ে বলছি বটে। কিন্তু আর দুই বহুড়ির মতনই ওর গায়ে একখানি লাল শাড়ি। এমন কি মাথায় অল্প ঘোমটাও আছে। ঠিক নজরে আসছে না, ওর সিঁথিতে সিঁদুর আছে কী না। কিন্তু দু হাতেই রং-বেরংয়ের কাঁচের চুড়ি। ওর গায়ের রঙটাও গঙ্গার গৈরিক জলের মতন। গায়ের রং এমন হয় কী না জানি না। আমার চোখে সেইরকমই লাগছে। আসলে গায়ের এমন রঙকেই বোধহয় মাজা মাজা ফরসা বলে। পশ্চিমাংশের ছেলেটির রঙ অবিশ্যি কালো।

দশ বছর বয়সটা অনুমানে বললাম। মেয়েটির বয়স দু এক বছর বেশি হতে পারে। ও বসে বসেই শুটি ছিঁড়ছে আর এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে নড়াচড়া করছে। তার মধ্যেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল। একবার না, কয়েকবারই দেখলো। কিন্তু হাতের কাজে কামাই নেই। আমি আমার মনে, ও ওর মনে। তবু কয়েকবার মুখ ফিরিয়ে দেখার মধ্যে, ওর কালো চোখের কৌতূহল স্পষ্ট। বোধহয় ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসাও চোখের কালো তারা যুগলে। বিরক্ত হচ্ছে নাকি?

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। পশ্চিমাংশের ছেলেটি একবার মাত্র চোখ তুলে দেখেছে, সেটা খেয়াল করেছি। তাকে কিশোর বলবো না নওজোয়ান বলবো বুঝতে পারছি না। সে তার নিজের কাজে ব্যস্ত। সবাই কাজের মানুষ, কাজ করছে, আমিই কেবল অ-কাজের মানুষ, চরে চরে বেড়াচ্ছি। খানিকটা এগিয়ে যেতেই, মটরশুটির ক্ষেতের মাঝখান থেকে বালিকার স্বর শোনা গেল, তু কহাঁ যাওতানি?

আমাকে নাকি? পিছন ফিরে তাকালাম। কঞ্চি হাতে সেই নেংটিটা, প্রায় হাত দশেক ফারাক রেখে আমার পিছনে। সাহস বেড়েছে, না কি কৌতূহল মেটেনি? আমি পিছন ফিরে তাকাতেই, কঞ্চি হাতে ও ঢুকে পড়লো মটরের ক্ষেতে। আমি আবার বালিকার দিকে তাকালাম। দেখলাম যোবতী বহুড়ির কৌতুকের হাসিটা ওর ঠোঁটে চোখেও ঝিলিক দিচ্ছে। তাকিয়েছিল আমার দিকে। চোখা-চোখি হতেই, চোখ ফিরিয়ে নিজের কাজে মন দিল। আসলে ওর কৌতূহলটাও প্রায় শিশুর তুল্যই। বয়স হিসাবে তা-ই হওয়া উচিত। ও এখন লাল শাড়ির ঘোমটা টেনে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে মটরশুটি তুলছে। শহরে ওর বয়সী মেয়েরা এখন ফ্রক পরে ইস্কুলের ক্লাসে পড়া করছে।

বয়সটা বড় কথা, না জীবনধারণ? বোধহয় জীবনধারণই। না হলে একই বয়সের মেয়ে, জীবনধারণে দুরকম চরিত্র আর চেহারা। তার সঙ্গে আরও যেটা মনে আসছে, তা নিজেকে নিয়েই। বয়স আর জীবনধারণের বাধা না থাকলে, আমিও তো পাখির মতন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম মটরের ক্ষেতে। দু-চার গোছা তুলে নিয়ে, দিব্বি খোলস ছাড়িয়ে দানা চিবোতে পারতাম। বয়সের বাধাটাকে যদি বা ডিঙোনো যায়, জীবনধারণের ছাপ ছোপে বাবু মনিষ্যিটি হয়ে, কেমন করেই বা ফসলে হাত দিই? একমাত্র উপায় হলো, বালিকাটির কাছে

গিয়ে হাত পাতা। কিন্তু, হাত পেতে হয় তো বিমুখ হবো না, খালিকাটিকে বিব্রত করা হবে। দরকার কী? লোভ সম্বরণ করাই ভালো।

আমি পা বাড়াবার আগে, নেংটিটার দিকে ফিরে আবার আমার যোগা হিন্দিতে বললাম, ক্যায়া, তুম নাম নেই বাতায়েগা?

আবার সেই তীরবিদ্ধ হরিণের লাফ, এবং এবার ছুট দিল বালিকার দিকে। বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসিটা আমার ভিতরেও সংক্রামিত হলো, কিন্তু আওয়াজ দিতে পারলাম না। পশ্চিমাংশের ছেলেটি একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো। আমি পা বাড়ালাম। মটরশুটির সীমানা পেরিয়ে, প্রথমে চোখে পড়লো ভুঁয়ের বুকে লতায় পাতায় জড়ানো, উচ্ছে কিংবা করলা। মাঝে মাঝে লতাপাতা বাঁশের খুঁটিতে এমন উচু করে তুলে দিয়েছে, যেন তাবু খাটানো হয়েছে। নজর করে দেখলে দু একটি পাকা ফলও চোখে পড়ে, যাদের গায়ে নিশ্চিত পাখির ঠোঁটের খোঁচা লেগেছে। কেন না, লাল বীচি উঁকি মারছে, খোঁচা খাওয়া ফাটলে। অথবা পাকা করলা আপনিই ফেটে গিয়েছে।

অনেককাল থেকে দেখা, চরের ঐশ্বয দেখছি কম না। আরও কয়েক পা এগোতেই, প্রথমেই চোখে পড়লো, হলুদ আর সবুজে মেশানো বড় সড় একটি কুমড়ো। বেশ খানকটা জায়গা জুড়েই কুমড়োর ক্ষেত। হলুদ ফুল ফুটে আছে এদিকে ওদিকে। কুমড়ো যদিও আর দেখতে পাচ্ছি না। ফুলে ফুলে মৌমাছির ভিড়। আর এই প্রথম চোখে পড়লো প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। সবুজে হলুদে মেশানো মাঝারি মাপের প্রজাপতিগুলোও কুমড়ো ফুলের আশেপাশে উড়ছে। ওরাও কি এই নিরালা চরের বাসিন্দা? নাকি আমার মতনই হাতছানির সাড়া দিয়ে এসেছে?

তারপরেই বেশ খানিকটা লম্বা জমি কোদালের ঘায়ে ফালা ফালা হয়ে পড়ে আছে। সম্ভবতঃ নতুন কোনো বীজ বপনের প্রস্তুতি পর্বের পর, প্রতীক্ষায় আছে। এখন আমার সামনে উত্তরের প্রায় শেষ

সীমানার সেই একটি চালাঘর, সামনে দাঁড়িয়ে এক রোগা লম্বা কালো পুরুষ। আগেই যাকে দূর থেকে চোখে পড়েছিল। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, খাটো ধুতি কোচা দিয়ে পরা, গায়ে শুকনো গামছা জড়ানো লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাল বুনছে। মাথার চুল উসকো খুসকো, কিন্তু চরের বাকি পুরুষদের সঙ্গে একেবারে মিল নেই। চুলের মাপ বেশ বড়, আর তেলতেলে কালো কুচকুচে। গোঁফ নেই, তবে বেশ কয়েকদিন ক্ষৌরকারের কাছে গিয়ে বসা হয়নি, সেটা বোঝা যাচ্ছে, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি দেখে। গলায় দু-ভাঁজ কণ্ঠির মালা।

আমার খেয়া পারানিয়া ভরত থেকে, এ পর্যন্ত যে-কজন পুরুষকে দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে এ মূর্তির অমিল স্পষ্ট। তবু ভালো করে দেখে নিলাম, লোকটির মাথার পিছনে টিকি আছে কী না। নেই। চালা ঘরের ছোট ঝাপ খোলা। ভিতরে কী আছে, কিছু দেখা যায় না, কাঁচা মাটির মেঝে ছাড়া। দোতলা খড়ের চালের মাথার ওপরে ধুঁধুলের লতাপাতা ছড়ানো। লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে দু তিনটি ধুঁধুলও চোখে পড়ছে।

মূর্তি জাল বুনতে বুনতে আমার দিকে তাকালো। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলো, তারপরেই জিজ্ঞাসা, ওপারে যাবেন, না বেড়াইতে আসছেন?

যা ভেবেছিলাম। এ মূর্তির সঙ্গে অন্য পুরুষদের অমিল। বচনেই জানা গেল, এ মূর্তি বঙ্গ সন্তান। শুধু বঙ্গ সন্তান না, বঙ্গ-আলের সন্তান, তবু এ বঙ্গের বচন আয়ত্তের চেষ্টা স্পষ্ট। এতক্ষণ দেখে শুনে একবারও মনে হয়নি, এ চরে বাঙালীর দেখা পাওয়া যাবে। জাল বোনার সঙ্গে চেহারা দেখে, সম্পর্কটা কেবল জালের সঙ্গে, না কি এ চরের ভূমির সঙ্গেও বুঝতে পারছি না। বাঁশের খুঁটিতে একটি নৌকা বাঁধা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। জবাব দিলাম, বেড়াতেই এসেছি তোমরাও কি এ চরে থাকো নাকি?

জাল বুননকারি জবাব দেবার আগেই, ঘরের ভিতর থেকে পুরুষের স্বর ভেসে এলো, কার লগে কথা কও কুতুদা ?

ঘরের ভিতরে মানুষ আছে, এবং তার আওয়াজে বঙ্গ-আলের বচন আরও স্পষ্ট। কিন্তু কুতুও কি নাম হয় ? অবিশ্যি এ সব নামের হদিস খুঁজতে গেলে, থই পাওয়া যাবে না। কুতু জবাব দিল, এক বাবু বেড়াইতে আসছে, হুগলির থেক্যা।

তা হলে, কুতু কেবল জাল বুনছিল না, বা পুবদিকেই মুখ করেছিল না। আমি যে পশ্চিম কূল থেকে চরে এসেছি, সেটি ঠিক লক্ষ্য রেখেছে। ঘরেব ভিতরের লোকের জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে কুতু আমার দিকে ফিরে বললো, 'না বাবু, আমরা চরে থাকি না, ওই মাউড়ারাই থাকে।'

আপত্তির শব্দটা কানে খট কবে লাগলো। যদিও জানি, আমার এক কথাতেই, বাঙালটি ভিন প্রদেশের মানুষ সম্পর্কে, 'মাউড়া' শব্দটি ত্যাগ করবে না। বিশেষ করে, দেশ বিভাগের পরে যারা এ-বঙ্গে আগমন করেছে, আমাদের পাশের প্রদেশেব প্রতিবেশীদেব তারা উক্ত বিশেষণেই পরিচয় দিয়ে থাকে। তবে, কেবলমাত্র পূব দেশের লোকদের দোষ দিয়েই বা কী হবে। এখনও তো, খাস এ-বঙ্গেব সাধারণের মুখে, কথায় কথায় 'মেড়ো' বিশেষণটি শুনতে পাই। আর এ বিশেষণের মধ্যে যে কেবল তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই আছে, তা না। আমার কানে, বরাবরই ওই সব আখ্যার মধ্যে কেমন একটা বিদ্বেষের সুর বাজে। তবে হ্যাকা বোকার শত্রু কম। আমি অনায়াসেই হ্যাকা হয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'মাউড়া মানে ? তারা আবার কারা ?'

কুতুর হাতের কাঠি দ্রুত জাল বুনে চলেছে। তার মধ্যেই, সে আমাব অজ্ঞতায় হাস্য সম্বরণ করতে পারলো না, বললো, 'মাউড়া আবার কারে কয় বাবু, জানেন না ? ওই যে দেখতেছেন, সব চাষ আবাদ করতেছে, অদেরই মাউড়া কয়। আমরা কই মাউড়া, আপনেরা কন ম্যাড়ো।'

ম্যাড়ো মানে মেড়ো, সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। কুতু আমাকে সহজেই পশ্চিমবঙ্গবাসী ধরে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী তো বটেই, তবু আমিও পূব দেশ থেকেই এ বঙ্গে এসেছি। তবু আমি না বলে পারলাম না, 'আমার ধারণা ওরা বিহারের লোক, বিহারী।'

'হ, বাবু যারে কয় কদু, তার নামই লাউ বোঝলেন না?' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্য মূর্তি দাঁত দেখিয়ে হেসে বললো, 'আমরা কই মাউড়া, ঘটিরা কয় ম্যাড়ো, আবার খোট্টাও কয় অনেক লোকে। আপনে কী য্যান কইলেন কথাটা?'

বললাম, 'বিহারী।'

'ওর বোঝেন, যাই কন, সবই এক।' ঘরের থেকে বেরিয়ে আসা লোকটি বললো।

বুঝলাম, এখানে আমার জ্ঞানবাবু হয়ে কোনো লাভ নেই। কদু আর লাউয়ে যখন তফাত নেই, তখন ওই সব বিশেষণ বা আখ্যায় বা কী দোষ? প্রাদেশিকতার দোষ বিদ্বেষ? বলতে গেলে, কোন্ কথা কোন দিকে গড়াবে, কে জানে। দেখলাম, ঘর থেকে যে বেরিয়ে এলো, কুতুদার থেকে বয়স তার নিশ্চয়ই কিছু কম। গায়ে কিছু নেই। পরনের খাটো ধুতিটি হাঁটুর ওপর তোলা। বেঁটে কালো গাট্টা গোট্টা চেহারা। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। এর মাথার টেরিটি স্পষ্ট। কুতুর মতনই তুভাঁজ কণ্ঠির মালা, মোটা গলায় যেন চেপে বসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা চরে থাকো না তো, এ ঘরটা কাদের?'

'ঘর আমাদেরই।' কুতু জবাব দিল, 'বোঝলেন না, একটা ঘর-টর না থাকলে চলে না। দখল রাখতে হইলে, একটা ঘর থাকা দরকার।'

কথাগুলো কেমন যেন বাঁকাচোরা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের দখল?'

'ক্যান, এই চরের?' কালো গাট্টা গোট্টা অল্পবয়সী জবাব দিল।

হাত তুলে দক্ষিণে দেখিয়ে বললো, 'ওই ছাখেন, অরাও কেমন ঘর দরজা কইরা জুতজাত কইরা বসছে। থাকি না থাকি, ঘর একটা রাখতেই হয়।'

কুতু বললো, 'দাওয়া বোঝেন ও বাবু, বিষ্টি বাদলার কথা কই। তখন মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই না থাকলে চলে না। তারপরে বোঝেন, গরমের সময় রোদে থাকাও যায় না। গাছপালাও নাই।'

দখল রাখার কথার থেকে, কুতুব কথায় যুক্তি বেশি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে তোমরা থাকো কোথায়?'

'ওই-ওইখানে।' কুতু হালিশহরের কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে হাত তুলে দেখালো, 'হালিশহরের শ্মশানখোলা, তারপরে আশ্রম, তারপরে তেঁতুলতলার মোড় থেইক্যা উত্তরে গেলে, বাঁয়ে একেবারে গঙ্গার পাড়ে, আমরা কয়েক ঘর পাকিস্তানের লোক থাকি।'

কুতুর জায়গার বর্ণনা কিছুই আমার অচেনা না। কিন্তু সে যে-ভাবে আঙুল তুলে দেখালো, যেন ঘরই দেখাচ্ছে। আমি কোন-ছার, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন যারা দিনের বেলাও আকাশের তারা দেখতে পায়, তাদের পক্ষেও কুতুর অঙ্গুলি সংকেতের পক্ষে, তাদের কয়েক ঘর চিনে ওঠা সম্ভব না। হালিশহরের সদর রাস্তা বাঁক নিয়ে, তেঁতুলতলার মোড় চলে গিয়েছে অনেকখানি পূবে। সেখান থেকে আরও উত্তরে গিয়ে, বাঁদিকে গঙ্গার ধারে যেতে গেলে, বেশ খানিকটা পথ যেতে হয়। যতোদূর মনে পড়ে, বাঁদিকে পূর্ববঙ্গবাসীদের অনেক কাঁচা পাকা ঘর উঠছে রাস্তার বাঁ ধারেই। যাকে বলে কলোনি, সেইরকম আবাসস্থল, বোধহয় সেই কলোনির কিছু নামও আছে। আমি বললাম, 'ওদিকে তো বাগের মোড়।'

'হ হ, ঠিক কইছেন, বাঘের মোড়ের কাছেই।' অল্পবয়সী গাট্টা গোট্টা বলে উঠল, 'বাবু তো দেখি সবই জানেন! আপনাদের বাড়ি কোনখানে? কাঁচরাপাড়া না কল্যাণী নাকি?'

বাগের মোড় কেমন করে বাঘের মোড় হয়, তা আমার জানা নেই, তবে অল্পবয়সা জোয়ানের জিজ্ঞাসায় ত্রুটি হয়নি। এক কথায় যদি বাগের মোড়ের কথা বলতে পার, তা হলে, তার কাছে-পিঠের বাসিন্দা হওয়া বিচিত্র কী? বাগের মোড় হলো এমন একটি জায়গা, যার পূব দিকের রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে কাঁচরাপাড়া ইস্টিশনের দিকে। আর সোজা রাস্তাটা কয়েকশো গজ গেলেই, পুল পেরিয়ে নদীয়া জেলার কল্যাণী নগর। গাড়ি চলাচলের মতন পাকা সেতুর নীচে প্রায় শুকনো খাত। শুনেছি ওইটি ছিল একদা যমুনা নদী। বর্ষাকালে শুকনো খাতে জল দেখা যায় বটে, এই সময়ে লক্ষ্য করলে ক্ষীণ একটি জলের ধারা চোখে পড়ে। তবে সহজে না। বিস্তর গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবডালে ভাঙাচোরা নানা মাপের আয়নার মতন।

পূবে গেলে, কাঁচরাপাড়া ইস্টিশন অবিশ্যি যমুনার এপারেই। ইস্টিশন ছাড়িয়ে গেলে যমুনার খাতের ওপর রেল লাইনের সাঁকো। অথচ, আদি কাঁচরাপাড়া নদীয়া জেলার মধ্যে। বাগের মোড় ছাড়িয়ে গাড়ি চলাচলের পাকা সাঁকো পেরিয়ে কয়েক পা গেলে, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, আসল কাঁচরাপাড়া গ্রামের রাস্তা চলে গিয়েছে। আসল নাম কাঞ্চনপল্লী, এটি কেতাবী জ্ঞান। কাঞ্চনপল্লী বলেই কি অনেকে 'কাঁচরাপাড়া' উচ্চারণ করে? জানি না, কিন্তু অনেকের মুখেই নামটি উচ্চারিত হতে শুনেছি।

কাঁচরাপাড়া গ্রামের রাস্তাটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এটা কোনো কেতাবী ব্যাপার না, নিজের চোখেই দেখা। কল্যাণী যেতে গিয়ে, পশ্চিমের রাস্তায় খানিকটা গেলেই, ডান দিকে চোখে পড়ে সেই বিশাল বিখ্যাত মন্দির। বিখ্যাত বলছি বটে, হয় তো অনেকে জানে না, চোখেও দেখেনি। গ্রামের লোকেরা বলে কেষ্টরায়ের মন্দির। এ হলো ভাব ভালবাসার সম্বোধন, 'কেষ্টরায়'। আসলে কৃষ্ণরায়।

মন্দিরটি আটচাল, উঠোনটা আগাছায় ভরতি। মন্দিরের সংস্কার বলতে কিছু চোখে পড়ে নি। শ্যাওলা ধরা গোটা দেহে, কোথাও কোথাও পলেস্তারাও খসেছে। বিগ্রহের নামেই মন্দিরের নাম। এতো উঁচু মন্দির আর কোথাও দেখেছি, সহজে মনে করতে পারি না। ভিতের বেদীটিও তেমনি উঁচু। মন্দিরের সন তারিখ মনে করতে পারি না। সিংহদরজা, নহবতখানা, চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

আমাকে সেই রাস্তাটি টেনে নিয়ে গিয়েছিল কাঁচরাপাড়ার গ্রামের আরও ভিতরে, যেখানে দেখেছিলাম কবি ঈশ্বর গুপ্তের একটি ছোট-খাটো স্মৃতিস্তম্ভ। তিনি সেই গ্রামের লোক ছিলেন। কবি তো বটেই, তাঁর সংবাদ প্রভাকরের খ্যাতি বোধহয় আরও বেশি ছিল। কবির আকর্ষণই বেশি ছিল, কৃষ্ণরায়ের মন্দিরটা ফাউ হিসাবে দর্শন হয়ে গিয়েছিল। আসলে ঈশ্বর গুপ্তের জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলাম। নিরালা নিঝুম গ্রাম। এখন কেমন চেহারা দাঁড়িয়েছে জানি না। সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষে ঈশ্বর গুপ্তের নাম জানার কথা না। মাঠে ঘাটে কাজ করে, এমন কারোকে জিজ্ঞেস করেও কবির জন্মভিটে খুঁজে পাইনি। অবশেষে ধুতিপরা গায়ে গেঞ্জি এক প্রৌঢ় ব্যক্তি একটা ঝোপঝাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওখানে একটা মন্দির মতন আছে, দেখুন। আর কিছু আছে বলে তো জানিনে।'

হয়তো ছুটি-ছাটার দিনে গেলে গ্রামের উৎসাহী তরুণদের দেখা পেতাম। তারাই সব দেখিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু আমার হাত-ছানির রকম সকম আলাদা। কখন কোথায় ডাক পড়ে, নিজেও জানতে পারি না। অমনি ঘরের আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। সংসারে এমন অকাজের লোক সহজে জোটে না। আজ যেমন ত্রিবেণীর ডাকে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ চরের হাতছানি নিশি পাওয়ার মতন নামিয়ে নিয়ে এলো বাস থেকে। কিসের ডাকে ঘুরি ফিরি, কেন, কিংবা কার খোঁজে, নিজেও সব সময়ে জানতে পারি না। যদিও নারী নই, তবু

ছেলেবেলায় শোনা সেই গানটার মতন মনে হয়, 'আমি নারী হয়ে কত পারি সইতে / আর বাঁশী বাজাইস না কালা রাতে / শুনিয়া বাঁশীর গান মন করে আনচান / গৃহকার্য রয় না আমার স্মৃতিতে।...

সে তো না হয় রাধা নামের সাধা বাঁশীর ডাক। অভিসারের হাতছানি। কিন্তু আমার সময় নেই, অসময় নেই, বুকের ভিতরেই যেন কে বাঁশী বাজিয়ে ওঠে। তখন রইলো তোমার চার দেওয়াল। সে তো আমাকে বেঁধে নিয়ে যায় না, পাখির মতন ডানায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মনে হয়, সীমাহীন আকাশের নীচে কোথায় কী মহোৎসব চলেছে, সেখান থেকে কে আমাকে ডাক দিচ্ছে। আমি তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। অথচ সেই ছেলাবেলা থেকে এতো ঘুরেও ওকে খুঁজে পেলাম না।

দেখেছিলাম, বনশিউলির ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। ডালে ডালে পাতায় পাতায় শুঁয়ো পোকার ভিড়। বড় ভয়! সাহেবদের সমাধির মতন চৌকো ভিত্তি বেদী থেকে সূচালো গম্বুজ উঠেছে। গম্বুজ বললেও অন্য একটা ছবি ভেসে ওঠে। অনেকটা গীর্জার মাথার মতন। ভিত্তি বেদীর গায়ে, শ্বেতপাথরে কিছু লেখা ছিল, এখন আর মনে করতে পারছি না। লোকের কাছে বলতে লজ্জা করে। সরস্বতী ঠাকরুণ আমাকে নিয়ে খেলা করিয়ে বেড়ালেন, কাজে লাগালেন না। তবে এইটুকু স্মরণ করতে পারি, দৈনিক কাগজের পাতায় লিখেছিলাম, ছাপাও হয়েছিল। আজ আর কে তা মনে করে রেখেছে।

কিন্তু একটি কথা মনে এসেছিল। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম তরুণ কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতাটি ছাপিয়েছিলেন তাঁর কাগজে। নৈহাটি আর কাঁচরাপাড়া বেশি দূরেও না। তবে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎটা বোধহয় কলকাতাতেই হয়েছিল।

চরে দাঁড়িয়ে মূলের কূলের ভাবনা। এখন আমার এসব আর

চিন্তার দরকার কী? অল্প বয়সী গাঁট্টাগোঁট্টা, কুতুর সঙ্গীকে বললাম, 'না, আমি কল্যাণী কাঁচরাপাড়া কোথাও থাকি না। তবে ওসব জায়গায় ঘোরাঘুরি করা আছে। কিন্তু তোমাদের ঘর যেখানে দেখাচ্ছ, সেখানে গঙ্গার ধারে তো বিরাট ইঁটের ভাটা।'

'শোনছস নি রে বটা, বাবুর সব নখদপ্পনে।' কুতু জাল বোনা থামিয়ে হেসে বললো, তাকালো আমার দিকে, 'ঠিক কইছেন বাবু। তয় বাবু, ইঁটের ভাটি হইল উত্তরে। দক্ষিণে যে সোঁতভাসি খাড়ি আছে, আমাদের ঘর তার এই পারে। ওই যে দ্যাখেন আশ্রম, তার কাছাকাছি। ওই যে, ওই দ্যাখেন আমাদের পাড়া।'

হালিশহরের সবটাই ঘোরা আছে, আশ্রমের মন্দিরের চূড়াটাও দূর থেকে চোখে পড়ে। কিন্তু কুতুদের পাড়াটা আমার পক্ষে চোখে দেখে ঠাহর করা মুশকিল। তবে জায়গার অবস্থানটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছি। আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই, এবার বটা নামে বটের গুড়ির মতোই গাঁট্টাগোঁট্টা যুবক হেসে জিজ্ঞেস করল, 'বাবু কী করেন?'

তা হলেই তো মুশকিল। কী করি? বলতে পারি, তোমাদেরই আশেপাশে ঘুরিফিরি। কেন? না, খুঁজে ফিরি। কী খুঁজে ফেরেন? ওখানেই ঠেক। কারণ, এই জবাবটাই জানা নেই। বললাম, 'কিছুই করি না।'

আমার জবাব শুনে কুতু আর বটা নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করে হাসল। দেখলেই বোঝা যায়, ওদের হাসিতে যেমন কৌতুক তেমনি অবিশ্বাস। কুতু বললো, 'আরে বটা, সব কথা কি সব সময়ে কওয়া যায়? কাজের মানুষ দেখলে চিনা যায়।'

আমাকে দেখে তা হলে কাজের মানুষ বলে চেনা যায়? কুতু এমন নজর কোথায় পেলো? হেসে বললাম, 'কাজের মানুষ হলে কি এ সময়ে চরে বেড়াতে আসি?'

'সেই কথা কি বাবু কওন যায়?' কুতু বললো, 'কে যে কোন কাজে কোনখানে ঘুরে বেড়াইতেছে, কে কইতে পারে। সংসারে এমুন মানুষ তো দেখি না, কিছু করে না।'

মনে মনে ভাবলাম, বেকাররা তা হলে কী করে? কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা খুব বিবেচনার কাজ হবে না। কারণ তারাও কাজের কাজ কিছু না করুক, কিছু যে করে, তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাই। আসলে কুতু তো সংসারের আসল কথায় কিছু ভুল করে নি। কিছু না করার মতন নিপাট মানুষ কেউ নেই। বোধহয় শিশু বা পাগলও নেই।

'বাবুরে একটা কথা জিগাই।' বটা যেন তার কালো কুচকুচে চোখের তারায় কেমন একটু রহস্যের ঝিলিক এনে, হেসে বললো, 'আপনে কি পট কমিশনে চাকরি করেন?'

পটকমিশন? সেটি আবার কোন সংস্থা? মনে মনে বার কয়েক কথাটা আউড়ে, অন্ধকার মস্তিষ্কে বিজলি হানা আলোর ঝিলিক দিল। পট কমিশন কি পোর্ট কমিশনার্সের কথা সে জিজ্ঞেস করছে? জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কোন অফিসের কথা বলছো?'

'হ বাবু, কইলকাতায় বন্দরের আপিস আছে না? পট কমিশন যার নাম? তার কথাই কই।' বটার চোখের রহস্যের ঝিলিকে এখন ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

হঠাৎ পোর্ট কমিশনার্সে চাকরির কথা কেন বটার মনে এলো? গঙ্গার দু পাশে এতো কলকারখানা। সেসব ছেড়ে একেবারে 'কইলকাতার বন্দরের আপিস'-এর কথা কেন? তার মুখ থেকেই এই অপার রহস্যের সন্ধান নেবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, সেই অফিসের কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?'

বটা আর কুতু আবার নিজেদের দিকে চোখাচোখি করলো। কুতু যেন একটু বেশি মাত্রার বিনীত হেসে বললো, 'কথাটা হইল বাবু,

শুনছি এই চরের মালিক নাকি পট কমিশন। হ্যাটকোট পরা এক বাবু দুই একবার এই চরে ঘুইরা গেছে। চরের নাকি মাপ জোক হবে, খাজনা বসাইবে। তাই ভাবলাম, আপনে বুঝি সেই আপিস থেকেই আসছেন।'

যে-যার চিন্তায়। দোষ দেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে, আমার থেকে, এরাই খোঁজ খবর বেশি রাখে। সংসারের কাজে লাগে, এমন চিন্তা তো সহজে মনে আসে না। গঙ্গার বুকে জেগে ওঠা, প্রকৃতির আপন হাতের দানও যে অন্যের মালিকানা আর খবরদারিতে থাকতে পারে, মনে আসেনি। সংসারের এক কূল থেকে আর এক কূলে ঘুরে বেড়ালেও, বাস্তবকে এড়িয়ে কবে জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে। জীবন তো দুই কূলের টানাটানিতে চলেছে। হেসে বললাম, 'কিন্তু আমি তো হ্যাট কোট পরে আসিনি।'

'তবু আপনের বাবুদের কথা আলাদা।' বটা বললো।

তা অবিশ্যি ঠিক। বাবুরা বড় সহজ প্রাণী নন। হ্যাট কোটই চাপান, আর ধুতি পাঞ্জাবীই পরুন, জাতে গোত্রে এক। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা টুপি মাথায় বাবু আর কী বলেছেন শুনি?'

বটা আর কুতু পরস্পরের দিকে এবার অবাক চোখে তাকালো। বটা বললো, 'সেই বাবুর মাথায় তো টুপি ছিল না বাবু!'

কী ব্যাজের কথা! হ্যাট কোট বললেই কি হ্যাট বুঝতে হবে নাকি? ওটা হলো একটা কথার কথা, হ্যাট কোট পরা। হ্যাট বললেই যদি টুপি বুঝতে হয়, তবে তো বাবু আপনি খুবই বুঝেছেন। ধরে নিন পট কমিশনের সেই বাবু আপনাদের কথায় স্যুট বুট পরে এসেছিলেন। এক কথায় সাহেব সেজে। আমি ভুল শুধরে নিয়ে বললাম, 'ও! তা বাবু আর কী বলেছেন?'

'আর কিছু না।' কুতু বললো, 'শোনলাম, চর জরীপ হবে, খাজনা বসবে। তখনই আসল বিলি বাটা হবে।'

কুতু আর বটার চিন্তা অনেক গভীরে। পট কমিশন, হ্যাটকোট পরা বাবু, চরের জমি জরীপ, বিলিবাটা, খাজনা, তাদের মাথায় সেই চিন্তা। আমাকে দেখে তাদের ধন্দ আর সন্দটা সেখানেই লেগেছে। অন্য কথা জিজ্ঞেস করবার আগে আমি তাদের ধন্দ ঘোচাবার জন্য বললাম, 'না, তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো, আমি কোনো আপিস টাপিসে চাকরি করি না। এমনি মন করলো, তাই চরে একবার বেড়াতে এলাম। তা, এখন তোমাদের বিলিবাটা কী রকম ?'

'এখন তো বাবু বিলিবাটার নামে কিছু নাই।' বটা জবাব দিল, 'আমরা এই ছ্যাশে যখন আসছি, তখন থেক্যেই দেখি, ওই মাউড়ারাই চর দখল কইরা রইছে।'

আবার সেই মাউড়া। আমারই বা আবার ন্যাকা হতে দোষ কী ? জিজ্ঞেস করলাম, 'মাউড়া মানে ?'

'মাউরা মানে মাউরা, আপনেরা যারে ম্যাড়ো কন।' বটা তার বত্রিশ পাটি শাদা দাঁত দেখিয়ে বললো।

আমি হেসেই বললাম, 'কেন, ওদের তো হিন্দুস্থানীও বলা যায়।'

'হ, এইটা ঠিক কইছেন বাবু।' কুতু বললো, 'হিন্দুস্থানীও কওয়া যায়।'

আমি আবার বললাম, 'তোমরাও তো হিন্দুস্থানী। না কি, পাকিস্তানী ?'

কুতু আর বটা দুজনেই পরিহাস ভেবে হাস্য করলো। বটা বললো, 'কথাটা বাবু ঠিক কইছেন। আপনেগো এই ছ্যাশের লোকেরা আমাগো পাকিস্থানি কয়।'

হ্যাঁ, এখনো এ পাপটা সমাজের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। এই পঞ্চাশ দশক থেকে ষাটের বা সত্তরের দশকে কী দাঁড়াবে জানি না। বললাম, 'ও কথা বোকারা কয়। আসলে তো তোমরা পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে এসেছো। তোমরাও হিন্দুস্থানী।'

'এইটা আবার কী কন বাবু ?' কুতুর মুখে পরিহাসেরই হাসি, বললো, 'পাকিস্তান ছাইড়া হিন্দুস্থানে আসছি, কিন্তু আমরা তো বাঙালী।'

কুতু আমাকে ধরতাইটা নিজেই ধরিয়ে দিল। হেসে বললাম, 'তোমরা যদি বাঙালী হতে পারো, তবে চরের ওই লোকগুলোকে বিহারী বলবে না কেন ?'

কুতু আর বটা ছজনেরই হাসি মুখে এবার অপ্রস্তুত ভাব দেখা দিল। আমি সময় না দিয়ে আবার বললাম, 'ঘটিরা যখন তোমাদের বাঙাল বলে, তোমাদের কি শুনতে ভালো লাগে ?'

'তা তো লাগে না বাবু।' কুতু জবাব দিল।

বটা বলে উঠলো, 'আমার তো হালার রগে রক্ত উইঠ্যা যায়।'

আমি হেসে বললাম, 'তা হলেই ভেবে দেখ, তোমরা যদি ওদের মাউড়া বল, আর এদেশী বাঙালীরা যদি মেড়ো খোট্টা বলে, তাহলে ওদেরও রগে রক্ত উঠে যেতে পারে।'

জোঁকের মুখে নুন, এমন বলবো না, কিন্তু বঙ্গআলের সন্তান ছুটিই হঠাৎ কোনো কথা খুঁজে পেলো না। বটার 'রগে রক্ত ওঠা' কথাটা আমার নতুন লেগেছে। মাথার বদলে রগ। কিন্তু এ বিষয়টা নিয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয় উচিত না। কুতু বটারা যদি মন থেকে মেনে নিতে পারে, আমি এতেই সার্থক মনে করবো। আর বেশি জ্ঞানবাবুর ছদ্মবেশ নিয়ে থাকা যাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা গোড়া থেকেই যদি দেখে থাকো, বিহারীরা এই চরের দখল নিয়েছে, তবে তোমরা এখানে কী কর ?'

'আমরা বাবু ছাশে থাকতে মাছ ধরতাম, গঙ্গায়ও মাছ ধরি।' কুতু বললো, 'তারপরে কিছু লোক আমাগো সলা পরামর্শ দিল, এই চরে আমরাই বা দখল নিমু না ক্যান। ভাবলাম, হ কথাটা অন্যায্য তো কিছু কয় নাই। আমরা ছাশের ঘর দরজা সব ছাইড়া আসছি,

আর এই চরে মাউড়ারা।' কথাটা শেষ না করে কুতু অস্বস্তিতে হেসে উঠলো, 'ওই হিন্দুস্থানীগো কথা কই, অরা ক্যান চর দখল কইরা থাকব? আমরাও আইসা ভাগ চাইলাম।'

কাজটা উচিত কি অনুচিত হয়েছে, সেই বিচার আমার কর্ম না। দখল দাখিল শব্দগুলোর মধ্যেই যেন জীবনের একটা অন্যদিকের অন্য জাতের চিত্র চরিত্র বর্তমান। অথচ আর কূটকচালি বলে, সব ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলে, সারা পৃথিবীর সিংহাসনে আজ যারা রং-বেরংয়ের রাজ্য চালাচ্ছে, তারা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসবে। গঙ্গার বুকে এই এক ফালি চড়া তো সামান্য কথা। পৃথিবীর যাবত চর নিয়ে কতো যুদ্ধবিগ্রহ, খুনোখুনি আর কূটকচালি চলছে। এই গ্রহের মহাদেশগুলোও তো এক রকমের চর। সেখানেও দখল নিয়ে, এ ওকে কতোরকমের সলা পরামর্শ দিচ্ছে, তার বয়ানের যতো চাতুরি, সব সংবাদপত্রের পাতায়। অতএব এ চর নিয়ে সবাই নির্বিকার সদানন্দ হয়ে থাকবে, তা কেমন করে হয়।

মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। এই নিরিবিলি চরটা ভেবেছিলাম, ভাঁটার উজানে ভাসে, জোয়ারে সমুদ্রগামী হয়। আপনাতে আপনি, নদীর মাঝখানে সুখে আছে। এখন দেখছি, দখলের লড়াইয়ে সে নিরিবিলির সুখে নেই। আমি সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তা, ভাগ পেয়ে গেলে?'

'সহজে কি আর ভাগ পাওয়া যায় বাবু?' বটা বললো, 'জোর কইরা আদায় করতে হয়।'

কুতু বললো, 'সে বাবু অনেক ব্যাপার। লাঠিসোটা লইয়া মারামারি হওনের যোগাড়। হিন্দুস্থানীরা দিব না, আমরাও ছাড়ুম না। তারপরে এই পার ওই পারের হিন্দুস্থানী বাঙালীরা এই চরে বইসা ঠিক করল, আপোষে মামলা মিটাইল। আমাগো চার ঘর জাইলাগো এই জমিটা দিছে।' বলে সে লম্বা কোদালে কোপানো

ফালা ফালা জমিটা হাত তুলে দেখিয়ে দিল। আবার বললো, 'তবু তো কিছুটা পাইছি।'

দখলের লড়াইটা ধর্মের কী না, বুঝতে পারছি না। চার ঘর বাস্তুহারার পক্ষে এই এক ফালি এমন কিছু না। সিংহভাগটা এখনও ভরতদেরই হাতে। তবে কুতুরা বাঙালী আর বাস্তুহারা বলেই তাদের দাবী গ্রাহ্য হবে কী না, সেই জিজ্ঞাসার জবাবটা ভরতরাই দিতে পারে। জীবনধারণের উপায় থাকলে, ওরাও কি এই চরের বুকে এসে বসতো? দেশ ভাগাভাগির জন্য না হতে পারে, ওরাও হয় তো বাস্তুহারা। কুরু-পাণ্ডবের লড়াই এটা না। তবু মানতে হবে, ভরতরাই বোধহয় প্রথম চরে এসে উঠেছিল। তাদের দাবীটাই আগে মানতে হয়।

'তিরবেণীর চরেও বাবু আমরা কিছু দখল লইছি।' বটা বললো।

কুতু শুধরে দিয়ে বললো, 'আমরা না আমাগো ছাশের লোকেরা নিচ্ছে।'

দখল হোক, আর জবরদস্তি হোক, মিথ্যা কথার বালাই নেই। সহজ স্বীকারোক্তি। দূর থেকে নদীর বুকে ভাসমান সবুজ রেখা দেখে হাতছানি পাই, অথচ তার বুকের খবর আলাদা। আমি যখন মন নিয়েই ঘুরে বেড়াই, মেদিনীর মূল্য প্রাণের অধিক। সেই জন্যই আদি থেকে শুনতে হয়, 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা জমিটা এমন কোদাল কুপিয়ে ফেলে রেখেছো কেন? চাষ করবে না কিছু?'

'আর কইয়েন না বাবু।' কুতু হতাশায় হেসে বললো, 'বোঝেন তো, এই চর অখনো ধান চাষের মতন হয় নাই। বর্ষাকালে জলে অখনো অনেকখানি ডুইবা যায়। সোঁতের টানেই সব ভাসাইয়া লইয়া যাইব। রবি চাষের ঘাতঘোত আমরা কম বুঝি। গরমের সময় ভুট্টা কিছু করছিলাম, ত সত্য কথা বাবু, আগে হিন্দুস্থানীদের

মতন পারি নাই। এইবারেও নানান ঝামেলায় দেরি হইয়া গেছে। মুসুরির বীজ দিছি, সামনে গেলে দ্যাখবেন এ্যাতটু এ্যাতটু চারা গজাইছে। কপাল মন্দ, বোঝলেন না? অগো ছোলার চারা দ্যাখেন, বুটি দেখা দিচ্ছে।'

কুতুর মুখে হতাশা, গলার স্বরে আক্ষেপ। বটা বললো, 'একটু বিষ্টি হইলে ভাল, তার তো কোন লক্ষণ দেখি না।'

একটা জায়গায় বোধহয় সবাই সমান। রাজ্য জুড়ে ভূমি পেলেই হয় না, তার দান চাই। কুতু বললো, 'তয় হ, একটা কথা কি বাবু আমরা মাছ ধরি। ওই যে দ্যাখেন, বান্ধাছান্দি জাল ফালাইছি। জাল টান দিয়া এই চরেই তুলি।'

পুব দিকে নদীর বুকে তাকিয়ে দেখি, পুবে পশ্চিমে, সারি সারি খান কয়েক মাঝারি মাপের লোহার ড্রাম ভাসছে। দু জায়গায় দুটো বাঁশের ডগা দক্ষিণ মুখ করে এমনভাবে ভেসে আছে আর কাঁপছে, যেন দুটো সাপের ফণা মাথা তুলে রয়েছে।

'তুমি আর কইয়ো না কুতুদা।' বটা বলে উঠলো, 'উজানের টান শেষ হইয়া আসল, তারপরে জাল বান্ধলা। এই উজানে কি আর জাল গুটাইতে পারবা?'

কুতু হাতের আধবোনা ঝাঁকি জালে একটা ঝাঁকুনি দিল। মুখে তার অপ্রস্তুতের হাসি। বললো, 'ইচ্ছা কইরা কি আর দেরি করছিরে বটা? দেখলি তো, পরতাপবাবু ঘরের রোয়াক ছাইড়া লামতে চায় না।'

কথা কোন দিকে বইছে, ঠিক ধরতে পারলাম না। আমার ধরবার কথাও না, অতএব কিছু জিজ্ঞাসা করা চলে না। কিন্তু আমার চোখ যেহেতু কুতুর দিকে ছিল, সে কেমন অস্বস্তি হাসলো, নিজের থেকেই বললো, পরতাপ সা, বোঝলেন নি বাবু কাঁচরাপাড়া নৈহাটিতে ব্যবসা করে। মাছের জন্য আমাগো আগাম টাকা দেয়। মহাজন

যারে কয় আর কি। উজানের গোন যায়গা, এই কথাটা সে না বুঝলে, তারে তো আর খ্যাদাইয়া দিতে পারি না। শত হইলেও খাতক তো।'

মাউড়া বলুক, সলাপরামর্শে চরের জমির দখলই নিক, তবু খাতক তো! এরপরে আর ভেঙ্গে বলতে হয় না, আগামের আর এক নাম দাদন। চরের এই জমিটুকুর চার ঘরের সম্বলে কিছুই না। নির্ভর এই গঙ্গার ওপর। আগাম পেটে চলে যায়, মহাজন রোয়াক ছেড়ে নামতে চায় না। কুতুর মুখের হাসিটুকু গরমডাঙ্গার জলের ফোঁটার মতন শুষে নিয়েছে।

জমি দখলের লড়াইয়ের কথা শুনে মনটা বিমর্ষ হয়েছিল। এখন এই শুকনো মুখ, অসহায় চোখ খাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখে বাক্যি সরছে না। জলে এখনও উজানের টান। চর ভাসে বিপরীতে। মূলে আর অকূলে এবার নিরিবিলি সুখের চর তুমিই বলো কোথায় যাই?

'কুতুদা, এই গোনে জাল টানা হইব না, বাড়ি চল।' বটা বললো।

কুতু বললো, 'হ, চল। বেলাও হইল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম 'আবার কখন আসবে?'

'তা বাবু, রাত্রে একেবারে খাইয়া লইয়া আসুম।' কুতু বললো, 'আইজ শ্যাষ রাত্রের আগে আর জাল টানা হইব না।' সে কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত জাল গুটিয়ে নিতে লাগলো।

আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'তা, ওদের সঙ্গে এখন আর ঝগড়াঝাটি নেই তো?'

দুজনেই কেউ প্রথমে আমার কথাটা ধরতে পারেনি। কুতু জিজ্ঞেস করলো, 'কাদের কথা কন বাবু?'

আমি মুখ ফিরিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখালাম। বটা হেসে জবাব দিল, 'না বাবু, ঝগড়াঝাটি নাই, তবে বোঝেন তো ভাগ লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে

ঠ্যাই ঠ্যাই হয়। কথাবাত্তা আছে, তবে মনে সুখ নাই। আমাগো না, অগোও না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের মনে সুখ নেই কেন?'

'ভগমানে যদি না ডুবায়, তাইলে এই চরের গতর আরও বাড়ব।' বটা বললো, 'আমরা আর খানিক জমি চাই।'

কুতু বলে উঠলো, 'আমার বাবু মত নাই। লোকেরা আমাগো সলাপরামর্শ দিতেছে, আমার মন লয় না। অগেও তো বাবু অনেক-গুলাইন প্যাট, খ্যাট কই? জোর জবরদস্তি করলেই তো হইল না।'

ভাবি, সলাপরামর্শ দেবার লোকগুলো কারা? তারা করে কি, সংসারকে দেখেই বা কোন নজরে? অবিশ্যি জানি, ভেবে লাভ নেই। সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, পরোপকার তাদের পেশা। তুমি কি ভাবো, তুমি কি চাও, সেটা কোনো কথার কথা না। আমরা তোমাদের উপকার করবো, সেবা করবো, লড়াই করবো, তোমাদের জীবনের দায় দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। এই আমাদের কাজ, সংসারকে এই চোখে আমরা দেখি। তোমরা কুতু বটারা কেউ না, আমরা তোমাদের মা বাপ। আমরা যা বলবো, তোমরা তাই করবে। তা না হলেই অশান্তি। ভেবে ত্যাদরে চিনতে হয় না, সমাজের বুকে তারা লাঠি ঘুরিয়ে বেড়ায়। সবাইকেই ত্যাদের চিনতে হয়। পরোপকার যে তাদের পেশা অর্থাৎ নিজেদের ভরণপোষণ। তোমাদের জন্য লড়ি, তোমাদের স্বার্থের জন্য সলাপরামর্শ দিই, অতএব তোমাদের শ্রমে আর ধনে আমাদের দাবী। আমাদের সঙ্গে থাকো ভালো। না হলে শত্রু।

কিন্তু খেটে খাওয়া কুতু অন্য মনের মানুষ। সে নিজের 'প্যাট খ্যাট' বোঝে, পরেরটাও বোঝে। তাই সে জোর জবরদস্তি চায় না। বটার চিন্তা একটু অন্যরকম। তার অনুমান চরের গতর আরও বাড়বে, তাই তার আরও খানিক জমি চাই। সে অন্যের প্যাট খ্যাটের কথা ভাবতে চায় না। কুতু দক্ষিণ দিকে মুখ তুলে দেখিয়ে বললো, 'অরা

'আমাগো ডরায়। ডরে ডরে থাকে, কী জানি আবার কোন দিন আমরা আরো বেশি দখল লমু।' বলে হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবুর ঘড়িতে কয়টা বাজে ?'

আমি কবজি তুলে দেখে বললাম, 'তুটো বেজে গেছে।'

'এখন তা হইলে যাইতে হয়।' কুতুই বললো, 'এই উজানে গেলে তাড়াতাড়ি যাইতে পারুম। বাবুর লগে দেখা হইয়া ভাল লাগল। বেড়াইতে আসছেন, আর বোধহয় দেখা হইব না। কতক্ষণ থাকবেন ?'

আমি বললাম, 'কতক্ষণ আর ? যতক্ষণ ভালো লাগে, থাকবো, তারপরে চলে যাবো। আমারও তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো।'

কুতু আর বটা তুজনে তুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। কুতু তু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'যাই বাবু।'

'হ্যাঁ, এসো।' আমিও কপালে হাত ঠেকালাম।

বটাও কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে, নীচের দিকে নেমে গেল। তার পিছনে পিছনে কুতু। কিন্তু নৌকায় আগে উঠলো কুতু। তারপরে নৌকার দড়ি খুঁটি থেকে খুলে, বটা উঠলো। উজানের টানে তাদের নৌকা উত্তর পুব কোণ নিয়ে ভেসে চললো তরতরিয়ে। বটা তার ওপরে বৈঠার চাড় দিল। এ গতির সঙ্গে দৌড়েও পাল্লা দেওয়া যাবে না।

আমি পিছন ফিরে তাকালাম। আশ্চর্য, সব হাওয়া। কেউ নেই। যোবতী আর প্রৌঢ়া বহুড়ি, সঙ্গের পুরুষটি আর আলু তুলছে না। কিশোরীটি আর তরুণ, অথবা হয়তো কিশোরই, আর সেই কঞ্চি হাতে নেংটিটা, কেউ নেই। নিশ্চয় এ বেলার মতন কাজ শেষ করে সবাই দক্ষিণের চালা ঘরে ফিরে গিয়েছে। উত্তরায়ণের বেলা বেশ কিছুটা পশ্চিমে ঢলেছে। কাজের লোকেরা কাজ শেষে নাওয়া খাওয়া সারতে গিয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই মনটা কেমন খচ করে উঠলো। যেন একটা সন্দেহের কাঁটা ফুটে গেল। আমি কুতু আর বটার সঙ্গে কথা বলছিলাম বলে, ওরা আবার কিছু ভেবে বসে নি তো? মন গুণেই তো ধন। ভাবতে অসুবিধা কী, বাঙালী বাবু বাঙালীদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। তা হলে আমি নাচার। ওদের চুপচাপ কাজের ব্যস্ততা দেখে কোনো কথা পাড়তেই অস্বস্তি হচ্ছিল।

কিন্তু এখন এই চরের বুকে দাঁড়িয়ে মনের এই খচখচানি ঝেড়ে ফেলাই ভালো। অনেক দিনের হাতছানিটা আজ দৈবে ঘটে গেল। পরের কি কথা, নিজের মনের অন্ধি-সন্ধি কজনে জানতে পারে? নিজেও জানতাম না, ত্রিবেণীর পথে যাত্রা করে, চর দেখতে দেখতে ছুটে চলে আসবো। তখন জানতামও না, কেমন করে আসবো, আর ভরত নামে মরদ বলতে গেলে আঘাটায় নৌকা নিয়ে বসে থাকবে। তবে নৌকাটা চোখে পড়ে, মনে কেমন একটা আশা জেগেছিল। তার আগে গড় করি নানীর গোড়ে, তাকে দেখেই কেমন একটা ভরসা হয়েছিল, নৌকা আসবে এই চরে।

দৈবে যখন চরে আসা ঘটেই গেল, তার ভুঁয়ে একটু শরীর ঠেকিয়ে বসি। বাবুর মন এখন একটু চা চা করছে। সে-আশায় ছাই। এই চরে আমার জন্য কেউ চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে নেই। আমি আরও উত্তরে পা বাড়ালাম। শেষ সীমাটুকু দেখি।



বেশি দূর যেতে হলো না। উত্তরের শেষ সীমানাটা, কুতুদের খালি ঘরটা থেকে হাত দশেক দূরেই শেষ। পাড়টা বেশ খাড়াই। জোয়ারের জল নেমে গেলে, চরের ভূমির আদল কেমন দেখাবে, কে জানে? রোদটা বেশ কড়াই লাগছে। দেখছি উত্তরের এই শেষ

সীমায়, কয়েক হাত লম্বা আর, তার থেকে কিছু বেশি চওড়া জায়গায়, কুমড়ো ধুঁধুল জড়াজড়ি করে লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ধুঁধুল চোখে পড়লেও কুমড়ো একটাও দেখলাম না। তবে কুমড়ো ফুল আছে।

যার যেমন নজর। কুমড়ো ফুল দেখলেই ফুলের বড়া ভাজার কথা মনে পড়ে যায়। পড়ে গেলে, ঢোঁক গিলেই সাধ মেটাতে হয়। একেবারে শেষ সীমানায় উঁচু পাড়ের মাটি শক্ত, লম্বা লম্বা চাবড়া আর মুতো ঘাস জমেছে গোছা গোছা। জাতে এরা দূর্বা না, তার থেকে চওড়া আর লম্বা। কিন্তু রোদে না বসে, আমি কুতুদের ঘরের পিছনে, বেড়ার বাইরে ফুট খানেক উঁচু ভিতের মাটিতে বসলাম। কারণ এখানে ছায়া আছে। চোখের কালো ঠুলিটা খুলে, আগে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, একটি সিগারেট ধরালাম।

দেখছি, নদী কিছুটা পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। দূরের উত্তরের ত্রিবেণীর চড়ার অংশবিশেষ নজরে আসছে। কুতুদের নৌকাটা ডানলপ ফ্যাকটরির খেয়াঘাটের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। পুব পার ঘেঁষে চলেছে। আকারে এখন অনেক ছোট দেখাচ্ছে। খেয়াঘাট, শ্মশান, আশ্রম সবই দেখতে পাচ্ছি। তারপরে লোকালয় একটু এগিয়ে এসেছে। বাঁকের মুখে যেমনটি হয়। আরও দূরে, পুবের ডাঙায়, ইঁট খোলাটা দেখলেই চেনা যায়। ইঁট পোড়াবার কলের চিমনিতে ধোঁয়া উড়ছে। ধোঁয়া উড়ছে বাঁশবেড়ের চটকলের উঁচু চিমনি থেকেই। ধোঁয়া উড়ে চলেছে দক্ষিণ পুব কোণে। হাওয়ার আগমন উত্তর পশ্চিম থেকে। সেই দিকেরই আড়াল থেকে এক একটা সাদা মেঘের টুকরো, মাঝে মাঝে উঠে আসছে। যেন দূরের আড়ালে, আকাশের কোথাও তারা জমায়েত হয়েছে। যখন যার সময় হচ্ছে, সে নিজের নানা রকমের আকার নিয়ে ভেসে আসছে। আসতে আসতে আবার আকার বদলাচ্ছে, আর যেন ঘুম ঘুম গড়িমসি চালে উড়ে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে ? পুব-দক্ষিণের সাগর কূলে নাকি ?

শরৎকালের মতন, এই সাদা মেঘে স্বপ্ন আছে। যদিও 'মাঘের আকাশের নীল আর শরতের নীলে তফাত আছে। আর সেই আকাশের মেঘের চালচলন সব সময় এমন গদাইলস্করি না, আকারেও এতো ছোট না। তবে ঠিকানাহীন অচেনা কাকে যেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, মনে যদি ওড়বার ডানা দিয়েছিলে, তবে অমন সাদা মেঘের সওয়ার হবার মতন ডানায় জোর দিলে না কেন ?

এতক্ষণে লক্ষ্য পড়লো, গঙ্গার এপারে ওপারে কাক যাতায়াত করছে। নিতান্ত প্যাট খ্যাট, নাকি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে যাতায়াত ? সীমানা নিয়ে লড়াই নেই তো ? উত্তরের পশ্চিম কূলে হংসেশ্বরীর মন্দিরের চূড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অনেক গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। কাঁচরাপাড়ার কেষ্ট রায়ের মন্দিরের মতনই। হংসেশ্বরীর মতন মন্দির আমি পশ্চিমবঙ্গে আর দেখতে পাইনি। বলতে গেলে, গড়বেষ্টিত রাজবাড়ির পাঁচিলের বাইরেই সেই মন্দির।

হ্যাঁ, রাজবাড়ি। বিরাট সিংহ দরজার মাথার ওপরে, সিংহের অঙ্গের অনেকটাই কালে খেয়েছে। রাজবাড়িটা দেখলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। উঠোনের তারে ঝোলে ধুতি শাড়ি, রোয়াকের ওপর সামান্য জামা কাপড় গামছা। প্রাসাদটি দেখলে বোঝা যায়, এক সময়ে নিশ্চয়ই তার রমরমা ছিল। পিছনে ইতিহাস অবিশ্যিই আছে। তবে সে-খোঁজে এখন আর কী দরকার। বাঙালীর কাছে নতুন কিছু না। অবাক কথা যেটা, সেটা হলো এই বংশের আদি পুরুষ রামেশ্বর রায়চৌধুরিকে বাদশা ঔরংজেব রাজা মহাশয় উপাধি দিয়েছিলেন। বাদশা যে বড় হিন্দুবিদ্বেষী বলে জানি ? তবে হিন্দুকে এত তোয়াজ কেন ?

এ সব হলো কেতাবী কথা, কেতাবী জিজ্ঞাসা। তবে, আমি দেখেছি গড়ের পরিখায় ক্ষীণ জলের ধারা। বনশিউলি আর

আশশ্যাওড়ার ঝাড়। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে, সড়সড়িয়ে গোসাপের ছুটোছুটি।

চারদিক চুপচাপ নিঝুম। হংসেশ্বরীব মন্দিরের চারপাশেও বিস্তর আগাছার ভিড়। শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। শুঁয়ো পোকা যত্রতত্র। সাপের ভয়টা থেকে থেকেই গায়ে শিরশিরিয়ে উঠেছিল। তবু মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ছ'তলার ওপরে উঠেছিলাম। তলাগুলো নিশ্চয়ই তেমন উঁচু না। তবু মাথার ওপরে ছয়টি চূড়াসহ, মন্দিরের উচ্চতা সত্তর ফুট। এটি আমার কেতাবী জ্ঞান। নিজের হাতে মাপিনি, সম্ভবও ছিল না। যখন কেতাবী মানে আবও জেনেছি, ষটচক্র ভেদের পাঁচটি নাড়ি ; ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বজ্রাক্ষ আর চিত্রিণীর প্রতীক মন্দিরের পাঁচটি সোপান। হংসেশ্বরী তার মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী রূপে বিরাজ করছেন।

কেতাবের কথা থাক। বাড়ির উঠোনের সীমানায়, পুবে বাসুদেবের মন্দিরটি আমার নজর কেড়েছিল বেশি। বিবর্ণ আর ক্ষয়ের মুখে বটে, কিন্তু মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার কাজের তুলনা নেই। বিষ্ণুপুরের মন্দির ছাড়া, আর কোথাও কোনো মন্দিরের সারা গায়ে এতো টেরাকোটা দেখিনি।

দেখিনি কি? একটু বোধহয় ভুল হলো। আবও কোথাও কোথাও দেখেছি। পুবপারের হালিশহরেই দেখেছি। এখান থেকে ঠিক চোখে পড়ছে না। গঙ্গার ধারেই যেখানে এখন বালির ঢিবি সেখানে ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার অনেক কাজ দেখেছি। দেখেছি শিবের গলির মন্দিরও। সদর রাস্তার ওপরে, গঙ্গার ধারেও মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা কেবল কালেব গ্রাসেই যায়নি। শুনেছি, মানুষের গ্রাসেও গিয়েছে। শিবের গলির মন্দিরের পোড়া ইঁটের কারুকার্যের খণ্ডগুলো একেবারে নিঃশেষ হতে পারেনি। বোধহয় গলির মধ্যে বলেই। তা ছাড়া, মন্দির সংলগ্ন গৃহের এক বৃদ্ধা

মহিলাকে দেখেছি, কড়া নজর রাখতে। মন্দিরটি সম্ভবত তাঁরই মালিকানা স্বত্বের মধ্যে। লোকজন কেউ এসেছে, টের পেলেই তিনি বেরিয়ে আসেন। ধমমো টমমো সব গুলে খেয়েছে। আপদগুলো মন্দিরের গায়ের ইঁট খুলে নিয়ে যায়। তা কাঁহাতক আর চোখে চোখে রাখা যায়?'

বৃদ্ধা মহিলাকে বলতে শুনেছি। তাঁর ভাষা কর্কশ, চোখে সন্দেহ কিন্তু তার জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। চোখে চোখে রেখেও যে তিনি হাড় হারামজাদাদের হাত থেকে মন্দিরের পোড়া ইঁটের পটগুলো বাঁচাতে পারছেন না। নানা ভাবে টেরাকোটার টুকরো খুলে নেবার চেষ্টা, অর্ধেক ভাঙা অর্ধেক উধাও মানুষের হাতের কীর্তির ছাপ স্পষ্ট। অথচ এমন না, যে মন্দিবটা লোকালয়ের বাইরে জঙ্গলে পড়ে আছে। পাড়ার মধ্যে। শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা এখনও হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এক শ্রেণীব শিল্পরসিকদের টাকার লোভে, এক শ্রেণীর উঞ্ছেরা মন্দিরের শরীরকে বিকৃত করে। প্রাচীন শিল্প সম্ভারকে ঘরজাত করতে না পারলে, সেইসব শিল্পরসিকদের শিল্পেব ক্ষুধা মেটে না। ভেঙে পড়া অযত্নে পড়ে থাকা প্রাচীন নিদর্শন কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করা এক কথা। আর ভেঙে চুরে চোরাইমাল ঘবজাত করা আর এক কথা।

কিন্তু আমার এ অলস আক্ষেপের কী দাম আছে? সবাই জানে, ভারতের প্রাচীন যে কোনো শিল্প নিদর্শন এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসার ধন। বড় বড় বিগ্রহই চালান হয়ে যাচ্ছে। পোড়া ইঁটের ছোট ছোট শিল্প খণ্ড তো কিছুই না। একে বলে মূল্যবোধের পরিবর্তন। একদা যে মন্দিরকে মানুষ ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক দেবালয়ের চোখে দেখতো এখন তার গায়ের আবরণ খুলে নেবার জন্য, ছেনি হাতুড়ি সাবল খোঁচাতেও দ্বিধা নেই। কালই শুধু আগ্রাসী না, মানুষকেও সে তার সঙ্গী করে নিয়েছে। এটাও বোধহয় কালের

ধর্ম কিন্তু কালের ধর্মে একদা কুমারহট্ট হালিশহর হয়ে যায় কেমন করে ? যখন, / 'গঙ্গার পশ্চিমকূল / বারাণসী সমতুল' ছিল, সম্ভবত তখন সরস্বতী নদীর কূলে সপ্তগ্রাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এ সব হলো ইতিহাসের কেতাবী সংবাদ। তখন উত্তর চব্বিশ পরগণার সীমান্তের পুব কূলের হালিশহর নাম কেউ জানতো না। জানি না, আদৌ চব্বিশ পরগণা নামটাই তখন ছিল কী না। কুমারহট্ট যে সেকালে শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের বিশেষ গৌরবস্থল ছিল, ইতিহাস তাই বলে। কিন্তু সেই কুমারহট্ট নামটা গ্রাস করলো কালের কোন্ নির্দিষ্ট সময়টিতে ? অনেক ঘোরাঘুরি করেও, কুমারহট্ট নামে কোনো গ্রামও খুঁজে পাইনি। একদা ঐতিহাসিক গ্রাম, নামে ধামে যার বেজায় রমরমা ছিল, অনেক সময় দেখা গিয়েছে, সেই গ্রাম বাঁশ ঝাড় আর ডোবায় ছড়াছড়ি এক জরাজীর্ণ কংকাল হয়ে পড়ে আছে।

কুমারহট্টের সেই রকম কোনো চিহ্নও খুঁজে পাইনি। অতএব, পুবের হালিশহরই সেই কুমারহট্ট, এমন ধরে নিতে হয়। শ্রীচৈতন্যের সময় কি কুমারহট্ট নাম ছিল ? কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বর্ণনায় তো দেখছি 'বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী / যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।'...তার মানে, হালিশহর নামও নতুন না। মুকুন্দ-রামও কুমারহট্ট বলেননি। তবে ভাবতে গিয়ে একটা দূরকালের ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি এখন গঙ্গার মাঝখানে চড়ায় বসে আছি, হয় তো এর ওপর দিয়েই কবিকঙ্কণের নৌকা দক্ষিণে ভেসেছিল। কেমন ছিল সেই নৌকা দেখতে ? কতো মাঝি মাল্লা ছিল ?

কল্পনায় একটা ছবি ভেসে ওঠে। যদিও সেই ছবিটার আসল বর্ণনাও রয়েছে কাব্যের মধ্যেই। আধুনিক মুকুন্দরামদের চোখে গঙ্গার ছবিটা আর তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এ নদীর

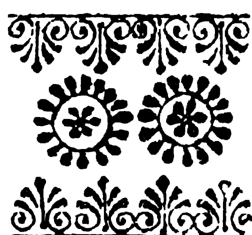
নাম এখন সাহেবদের ভাষায় হুগলি নদী। দুই তীরে কলকারখানার ভিড়। বন্দর সরে গিয়েছে অনেক দক্ষিণে, কলকাতা শহরে। মুকুন্দরাম বন্দর দেখেছিলেন ত্রিবেণীতেই। সেই জন্যই বোধ হয় যাত্রীদের কোলাহলে তাঁর কান পাতা দায় হয়েছিল। হালের কথা বলতে গেলে, দুই তীরকে বোধহয় শিল্পনগরী বলতে হবে। কোলাহল কি আদৌ কিছু কমেছে?

তবে হালিশহর? যে একদা শহরতুল্য ছিল, এই পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি তার ধ্বংসস্তূপের ছবি দেখলে সেই কথাই মনে হয়। বাদশাহী জরীপে, হাবেলী পরগণার মধ্যে হালিশহরের নামোল্লেখ আছে। হাবেলী পরগণার সীমানাও কম না। এখন বোধহয় তার সীমানা সহরদ্দের দলিল দস্তাবেজ ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়ে-সানের মহাফেজখানায় পাওয়া যাবে। কার আমলে হাবেলী পরগণা নামে একটি পরগণা তৈরি হয়েছিল? মুঘল আমলের কোনো স্থানীয় শাসনকর্তার আমলে কী?

মাঝ গঙ্গার চরের কূলে বসে মনে মনে ইতিহাসের পাতা উলটে লাভ কি। তবে বিদ্যাসাগরের যুগে কোন কুলীন ব্রাহ্মণ কতো ব্রাহ্মণী বিয়ে করেছিলেন, তার একটা গণনার হিসাবে দেখেছিলাম হালিশহরের নাম ছিল অনেক ওপরে। এই কেতাবী কথাটার সঙ্গে আর একটা পুরনো কিংবদন্তী মনে পড়ে যাচ্ছে। কিংবদন্তীটি কি নদীয়ারাজের সময়ে কারোর মস্তিস্ক প্রসূত? কিংবদন্তীটা ছিল খ্যাতি অখ্যাতি যাই বলো, 'গুপ্তিপাড়ার বাঁদর / হালিশহরের ত্যাঁদড়।'

ত্যাঁদড় চেনা দায়, বাঁদর চেনা যায়। গুপ্তিপাড়ায় ঘুরতে গিয়ে অনেক কিছু দেখেছি, বাঁদর চোখে পড়েছে বলে মনে করতে পারি না। হতে পারে, নদের রাজা কেষ্টচন্দ্রের সময়ে গুপ্তিপাড়ার বাঁদরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। আর সম্ভবত গোপাল ভাঁড়ের পরামর্শেই

তিনি বহু হাজার টাকা খরচ করে গুপ্তিপাড়ার বাঁদর বাঁদরির বিয়ে দিয়েছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের নামটা মনে এলো এই কারণে, মহাশয় সেই গ্রামের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের শ্বশুরবাড়ি বলেই, গুপ্তিপাড়ার আর একটি কিংবদন্তী মনে পড়ে যাচ্ছে। 'নদের মেয়ের খোঁপা / গুপ্তিপাড়ার চোপা।' চোপা বলতে ঝগড়া বোঝায়। এটাই আমরা জানি। তার সঙ্গে কি রসিকতার কোনো সম্পর্ক আছে ? থাকলে বলতে হয়, গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা হয়তো বউয়ের চোপা থেকেই পাওয়া।



উত্তরায়ণের বেলাটা কখন পশ্চিমে ঢালু বেয়ে তরতরিয়ে নেমে গিয়েছে, খেয়াল করিনি। জলের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, চড়া উজানে ছুটছে। জলের স্রোতের ঢল নেমে চলেছে দক্ষিণে। কখন জোয়ার শেষ হয়ে ভাঁটা পড়েছে লক্ষ্য করিনি। আরও টের পাওয়া গেল, কলকল ছলছল শব্দে। জোয়ারের ভরায় নদী শব্দহীন থাকে। ভাঁটার টানে একটা নাচের ছন্দ আছে। কূলে কূলে ছলছলিয়ে সে জানান দিয়ে যায়। সে আসে নিঃশব্দে, ভরে গেলে একেবারে চুপচাপ। নামার সময়ে নদী যেন সমুদ্রের ডাকে কলকলিয়ে ওঠে।

বেশ কয়েকটি সিগারেটের মুণ্ডু চিবানো গিয়েছে। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখে যায়, এমন একটি লাল থালা দূরের গাছপালার মাথায়। মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই হঠাৎ প্রায় পিছনেই গরগর চাপা গর্জন শোনা গেল। পিছন ফিরে তাকাতেই

দেখি চালা ঘরের কোণেই সাদায় কালোয় মেশামেশি এক সারমেয়। চরের বুকে কুকুর? এতক্ষণের মধ্যে একবারও তো আওয়াজ দেয়নি?

আমি ফিরে তাকাতেই শুরু হয়ে গেল ঘেউ ঘেউ ধমক। যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই প্রথমে চাপা গর্জন। তারপরেই হমবি তমবি। তাড়া দিয়ে এগিয়ে আসার লক্ষণ না দেখা গেলেও, ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধার মনে হলো না। তাড়া করলে যাবো কোথায়? যাদের সাহায্য পেতে পারি, তারা তো এখন আমার আড়ালে, দক্ষিণের সীমানায়। কে জানতো চরে এমন একটি চৌকিদার আছে। আর পকেটেও এমন কোনো দ্রব্য নেই যা দিয়ে চৌকিদারকে ঘুষ দেওয়া যায়। সিগারেট বা পয়সার ঘুষে নিশ্চয়ই সে বাগ মানবে না। খাদ্য বস্তুর কণামাত্র আমার পকেটে নেই।

বিপদ আর কাকে বলে। আমরা মাতাল দাঁতালের ভয়ের কথা বলি বটে। সময় বিশেষে সামান্য একটি পশুও অঘটন ঘটাতে পারে। যতো দূর জানি, পোষা জীব হলেও পশুকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এটাও জানি, ভয় পেলে, আরোই গোলমাল। অতএব আমি প্রথমে নিরীহ ভাবে আওয়াজ দিলাম, 'কী হয়েছে রে?'

জবাবে ঘেউ ঘেউ গর্জন বাড়লো। অচেনাকে কেয়ার করবে, চরের তেমন চৌকিদার সে না। আমি জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করে ডাকলাম। উদ্দেশ্য শান্ত করা। অথবা বিশ্বাস উৎপাদন করা। কাজে লাগলো না। জানি না, বাবুরা যখন দল বেঁধে জরু বালবাচ্চা নিয়ে বনভোজন করতে আসে, তখন চৌকিদারটি কী ভূমিকা নেয়। অগত্যা আমাকে উঠে দাঁড়াতে হলো।

দাঁড়ানো মাত্রই চৌকিদার ঝটিতি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চরের আকাশ ঝালাপালা করে তুললো। জানি, হাতের কাছে মাটির ঢ্যালার অভাব নেই। সে রকম বুঝলে ওর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধে

অবতীর্ণ হতেই হবে। কিন্তু চৌকিদার চিৎকার করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ এক আধবার পিছনে দেখে নিচ্ছে। আমি কয়েক পা পশ্চিমে যেতেই চৌকিদার দৌড়ে কয়েক পা পিছনে হটে হাঁক পাড়তে আরম্ভ করলো আর আমি দেখলাম, কঞ্চি হাতে সেই নেংটিটা হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে অবিশ্যি এখন কঞ্চিটা নেই। ওর কাছ থেকে আরও কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল, মটরশুটি ক্ষেতের সেই কিশোরী। মাথায় এখন ওর ঘোমটা নেই। এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে এক পা এক পা করে দক্ষিণে চলতে লাগলো।

আমি ভরসা পেলাম দুটো কারণে, নেংটিটা আর কিশোরী এসে গিয়েছে। আর একটা লক্ষণীয়, আমি নড়াচড়া করলেই চৌকিদার পিছনে হটে। কিন্তু নেংটিটার সাহস কি বেড়ে গেল নাকি? দেখছি, আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। অনুমান করলাম, ওর পিছনে পিছনেই চৌকিদারের আগমন। তারপরে হঠাৎ ভিনদেশীকে দেখেই তৎপর হয়ে উঠেছে। আমি নেংটিটাকে আমার নিজের মতন হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কিসকো কুকুর হ্যায়?'

আবার কথা? আমার জিজ্ঞাসা শুনেই নেংটিটা পিছন ফিরে কয়েক হাত দৌড়ে চলে গেল। গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকালো। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে চৌকিদারও নেংটিটার কাছে ছুটে গিয়ে, সেখান থেকে সমানে গলা ফাটিয়ে চৌকিদারি করতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপার দেখে আমার ভরসা বাড়লো। চোখ তুলে আরও একটু দূরে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখলাম। কিশোরী দাঁড়িয়ে পড়েছে। তবে মুখ ফেরানো পশ্চিমে। ওর ঘোমটা খোলা মুখে এখন মাঘের শেষ বেলার রাঙা রোদ! রঙ তেমন গাঢ় না, এখন লাল শাড়ি আর মাজা মাজা মুখে হাতে গলায়, হাতের কাঁচের চুড়িতে, বেলা যাবার আগের রক্তাভ একটা চোখ ভরিয়ে দেবার মতন রূপ নিয়েছে। গঙ্গার

মাঝখানে সবুজ চরের সঙ্গে কিশোরীটি যেন মিলেমিশে প্রকৃতিকে এক নতুন রূপ দিয়েছে। কী দেখছে ও তন্ময় হয়ে?

কিন্তু আমার হাতে আর সময় নেই। ভরত পাটনীর খোঁজ করতে হয়। দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা নামবে এবং অন্ধকারও। এতক্ষণে জলের তৃষাও বোধ করছি। দক্ষিণের সীমানায় ঝাড়ি ঝোপড়ি চালাঘর যাই বলা যাক, একবার সেখানে যেতেই হবে হয় তো কলের জল এক পাত্র পাবো। তারপরে মূলের কূলে। আমি পা বাড়ালাম। কিশোরীটির যেন তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চোখ পড়লো। ও আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো। আর নেংটিটাও এবার দৌড় দিল না, কিন্তু পিছন ফিরে ছোট ছোট পায়ের গতি বেশ দ্রুত। চৌকিদারও ওর পিছু পিছু চলেছে। তবে চিৎকারের হাঁক ডাকটা যেন একটু কম। এখন আর একটানা না, ক্ষণে চুপ, ক্ষণে হাঁক। দৃষ্টিতে অবিশ্যি তার অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

জলের দিকে তাকিয়ে দেখছি, টানে বেশ জোর। চর অনেকখানি জেগে উঠেছে। বালির ওপরে পলিমাটির কালো ছোপ, আস্তে আস্তে জলে গিয়ে নেমেছে। সীমানা খুব ছোট না। পশ্চিমের অংশটা দেখতে পাচ্ছি না। সেদিকে যতোটা খাড়াই দেখেছিলাম, এদিকে চর ততোটা খাড়াই না। ঢালু হয়ে, নীচের দিকে খানিকটা সমতলের মতোই জলে গিয়ে ডুব দিয়েছে। তবে সবখানে এক রকম না। কোথাও কোথাও বেশ খাড়াই।

চরের ধার দিয়ে পায়ে চলা সরু পথটা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মটর, অবশিষ্ট ফুল আর বাঁধা কপি, আলু, ছোলার সীমানা পেরিয়ে প্রায় চালা ঘরগুলোর কাছে। আমিই যেন কিশোরী, নেংটি আর চৌকিদারকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছি। ওরা চলেছে আমার আগে আগে। বাঁয়ে দূরের দক্ষিণপারে হাজিনগর মিলের কুঠি, চিমনি আর ধারে ধারে বিস্তর ঘর। আরও এগিয়ে সারি সারি কলকারখানা।

পশ্চিমে ডানলপের কুঠির সীমানা পেরিয়ে দক্ষিণের গোটা ধার জুড়ে গৃহস্থের ঘর আর ঘাট। ব্যাণ্ডেল গির্জার ক্রুশ, আরও কিছু দূরের আকাশে ইমামবাড়ার দুই চূড়া দেখতে পাচ্ছি। রেল সেতুর পুরোটা চোখে পড়ছে না। নদী ওখানেও কিছুটা বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে।

নেংটিটা দৌড়ে কোথায় কোন ঘরের আড়ালে চলে গেল। কিশোরীটি দাঁড়ালো এমন জায়গায় দোতলার চালে ওর শরীরের অর্ধেক ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বোধহয় সেখানে চালায় ঢোকার দরজা। চৌকিদারের চিৎকার নতুন করে শুরু হলো। ও বোধহয় আমার এতোটা এগিয়ে আসা পছন্দ করছে না। বলতে গেলে, ভুড়ুক ভুড়ুক টানে, সামনের চালার ডান দিকে দেখতে পেলাম, নানী একটা চটের ওপর বসে হুঁকো টানছে। তার বাঁ পাশে মাঝবয়সী বহুড়ি।

কিশোরীটিই বোধহয় কুকুরটিকে আওয়াজ দিয়ে তাড়া করলো। মাঝবয়সী বহুড়িটি কিছু বললো। নানী হুঁকা টানা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো। ভুরুতে চুল নেই। দুচোখ ভরা বিস্ময়, কপালে পলিচরের রেখা। বলে উঠলো, 'এ রউয়া, ইত্তি দেব তক তু কহাঁ রহলে ? চৌরে পর ?'

নানী ভাবতেই পারেনি, আমি এতক্ষণ চরে রয়েছি। হাত তুলে উত্তরে দেখিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ওদিকে বসেছিলাম।'

কুকুরটা চুপ করেছে। নানী আমার বাংলা বুলি বোধহয় ঠিক ধরতে পারলো না। সে তার বাঁ পাশে মাঝবয়সী বহুড়িকে জিজ্ঞেস করলো, 'কা কইলান ?'

মাঝবয়সী বহুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো, বুড়িকে বললো, 'রউয়া কইলান কি, উধার বাঙালীকো জমিন পর বৈঠ রহলে ?'

অথচ মাঝবয়সী বহুড়িটি যখন আলু তুলছিল, তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবাই যায়নি, সে এমন হাসতেও পারে। বাংলা

বুলিও যে সে বুঝতে পারে বোঝা গেল। আর 'রউয়া' শব্দটা এই প্রথম এদের মুখে শুনছি। শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে কোনো কোনো অবাঙালীর মুখে কথাটা আগেও শুনেছি। মানে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সম্মানীয় ব্যক্তিকে ওই শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়। এখন 'বাবু' সম্বোধনের বদলে 'রউয়া' শুনছি। যদিও ধারণা নেই, বিহারের কোন্ জেলার লোকেরা শব্দটি ব্যবহার করে। কিন্তু বুড়ি নানীর 'বাবা' সম্বোধনটাই আমার ভালো লেগেছিল।

মাঝবয়সী বহুড়ির জবাব শুনে নানী বলে উঠলো, 'হায় রাম! তু সলই হামে কইলান, বাবু বাঙালীকো নায়ে পর চল্ গেইলান।'

'হম না কহলে'। মনে হলো চালার আড়ালে শরীরের অর্ধেক ঢাকা পড়া কিশোরী আওয়াজ দিল, 'হম দেখলছি দো বাঙালী নায়ে 'পর চল গয়লান, ইয়োকো না দেখলবা।'

কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি, এরা সকলেই ভেবেছে, আমি কুতু আর বটার সঙ্গে নৌকায় করে চলে গিয়েছি। নানীকে সবাই তাই বলেছে। একমাত্র কিশোরী ছাড়া। কারণ সে দুই বাঙালীকে নৌকায় করে চলে যেতে দেখেছে, আমাকে দেখতে পায়নি। এ কোন্ দেশী হিন্দি বাত হচ্ছে, তাও যথেষ্ট ধরতে পারছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি। সকলের কেন এমন ধারণা হলো, আমি বাঙালীদের সঙ্গে নৌকায় চলে গিয়েছি? বাঙালী বলেই কি? অথচ কিশোরীর নজরে পড়েছিল, দুই বাঙালীকে সে নৌকায় করে যেতে দেখেছে, আমাকে দেখেনি। দেখেনি যদি তবে কী ভেবেছিল? আমি চর থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছি। দোতালার চালে ঢাকা কিশোরীর অর্ধাঙ্গ লক্ষ্য করলাম। নিজেকে ওর এমন আড়াল করার কারণ কী? বিদেশী পুরুষের সামনে লজ্জা? না সহবত?

'এ সুরি, তু কাহে না কহলে কি বাবা চৌরে পর রহল?' নানী ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

নুরি! সে আবার কেমন নাম? কিশোরীর শরীর কিঞ্চিৎ চালার বাইরে আত্মপ্রকাশ করলো, কিন্তু মুখ দেখা গেল না, বললো, 'হম কা কইলান? ইয়োকো হম না দেখল বা।'

মাঝবয়সী বহুড়ি আবার হেসে উঠলো। এখন তার কপালে মেটে সিঁদুরের ফোঁটা। ঘোমটা কপাল অবধি ঢাকা। একটি সবুজ রঙের কালো পাড় শাড়ি তার গায়ে। বোধ হয় কাজের শেষে, স্নান করে বসন পরিবর্তন হয়েছে। দু হাতের কাসার বালা জোড়া ঝকঝক করছে। নিশ্চয়ই মাজা হয়েছে।

এবার মাঝবয়সী বহুড়ির পিছন থেকে আগমন ঘটলো সেই যোবতী বহুড়ির। নীল কালোয় ডোরা, লাল পাড়ের শাড়ি তার অঙ্গে। কালো একটি জামাও তার গায়ে। জামা দেখেছি কিশোরী নুরির গায়েও। যোবতী বহুড়ির কপালেও সিঁদুরের ফোঁটা, কিন্তু মেটে সিঁদুরের না, বাঙালী বধূদের মতন লাল সিঁদুর তার কপালে। মুখটি তেলতেলে দেখাচ্ছে। এ চরের চালার বধূ কি কোল্ডক্রীম মেখেছে? বোধহয় না। তেল মেখেই চামড়ার কোমলতা রক্ষার চেষ্টা। তার মুখেও দেখছি হাসি। তার আঁচল ধরে গা ঘেঁষে রয়েছে নেংটিটা। আর একটু পিছনে শাদা কালো পাহারাদার ল্যাজ নাড়ছে।

যোবতী বহুড়ির সঙ্গে চোখাচোখি হলো মাঝবয়সীর। তাদের সম্পর্কটা কী কে জানে। দু জনেই প্রায় বালিকার মতন খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসির অস্ফুট আওয়াজ যেন চালার অন্য পাশ থেকেও শোনা গেল। নিশ্চয় কিশোরী নুরির। নুরি! কী তার মানে? নিশ্চয়ই বাঙলা শব্দের নুড়ি না। হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু আমি তো দেখছি, নানা বয়সের রমণীদের হাসির পাত্র হয়ে উঠলাম। নানীও দেখছি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, আর

হাসতে হাসতেই বললো, 'ই লোগন কা কওত, সমঝমে না আইলেবানি হো রউয়া। তু কহাঁ রহলে ইততিডেরতক ? কোই না দেখলেবারে ?'

আমি এবার নানীকে বোঝাবার জন্য, উত্তরে হাত তুলে দেখিয়ে, আমার মতন হিন্দিতে বললাম, 'উধার বাঙালীকে ঘরকে পিছে।'

আমার কথা শেষ হলো না। কিশোরীসহ তিন রমণী তিন স্বরে হেসে উঠলো। নেংটিটাও দেখি, আমার দিকে তাকিয়ে পোকায় খাওয়া দুধের দাঁত দেখিয়ে হাসছে। নানী বললো, 'হায় রাম! এ নুরি, ছোটা খাটিয়া কাঁহে না নিকল লে আয়ি ? বাবুকো বৈঠনে দে।'

এখন আবার বসা ? পশ্চিমের লাল থালাটা গাছপালার আড়ালে ডুবুডুবু। সময় কোথায় ? কিন্তু এই প্রথম আমার মনে একটা খটকা লাগলো। ভরত কোথায় ? তার বা অন্য কোনো পুরুষেরই দর্শন শব্দ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভরত কহাঁ ? উসকো নৌকামে হম আভি যানে মাংতা।'

এবার আবার দুই বহুড়ির হাসি। কাজের সময় যারা আমাকে দেখে একটি কথা বলে নি, বরং গম্ভীর মুখে নির্বিকার ছিল এখন তাদের মুখে এত হাসির ঝড় ঝড়ানিটি কেন ? নানী ডান হাতের হুকা বাঁ হাতে নিয়ে বলল, 'হায় রাম, ভরত ওহার বাপ চাচা, ঘণ্টাভর আগেহি নাহে পর চল গেইলান।'

নায়ে পর চল গেইলান ? সর্বনাশ! মুখ দিয়ে আমার বাঙলা বুলি বেরিয়ে পড়লো, 'কোথায় ?'

এবার মাঝবয়সী বহুড়ি কৌতুক হেসে জবাব দিল, 'উ লোগন শবজি উবজি লেয়ি শাগঞ্জ বাজার গেইলান।'

শবজি উবজি নিয়ে শাগঞ্জের বাজারে চলে গিয়েছে ? চরে এসে জলে পড়লাম ? হাতছানির এ কি রহস্য! এখন মূলের কূলে যাবো কী করে ? সন্ধ্যা যে নেমে এলো ? আমি একবার দেখলাম যৌবতী বহুড়ির দিকে। তার মুখে হাসি, চোখে কৌতুকের ছটা। তাকিয়েছিল·

আমার দিকে। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে তাকালো মাঝবয়সীর দিকে। জবাব দিল নানী, 'উ কে বাতাইবে হো রউয়া? সবলোগ বাজার গেইলান, আপনা মাল বিকাইবে, ঘরেকে মাল খরিদবে। মরদলোগন কো কা কুচ্ছ ঠিক বা? সিনিমা উনিমা চল যা সকত।'

আমি অসহায় চোখে একবার উত্তরে তাকালাম, আবার দক্ষিণে। ভরতরা যে কেবল মাল বেচাকেনা করে ফিরে আসবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবার 'সিনেমা উনিমা'-ও দেখতে যেতে পারে। এক ঘণ্টা আগেই তারা নৌকা নিয়ে চলে গিয়েছে। আর আমি তখন, চর, নদী, মূলের কূলের ভাবনায় বিভোর। ধরেই নিয়েছি, আমার তো ভরত আছে, মূলের কূলে যাবার ভাবনা নেই। আসলে, নিশির ডাকে চলে এসেছি, চরের জীবনযাপনের ধারাটা জানতাম না। জানলে কখনো এমন ফাঁদে পড়তে হতো না। ভরতই বা ভেবে নিল কেমন করে, আমি বাঙালাদের নৌকায় চলে গিয়েছি?

দোষটা বোধহয ভরতদের কারো না। যতেক খোয়াড় করেছে, আমার কুডুদের চালাঘরের আড়ালে বসা। দেখতে পেলে নিশ্চয়ই তারা আমাকে ফেলে রেখে যেতো না। আমার এই অগাধ জলে পড়া দুশ্চিন্তার ফাঁকে নুরি একটি ছোটখাটো খাটিয়া এনে আমার সামনে রাখলো। ওকে দেখেই আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগলো, ও যদি আমাকে বাঙালীদের নৌকায় যেতে না দেখে থাকে, সে কথাটা ভরতকে বলবে তো?

খাটিয়াটা রাখবার ফাঁকেই আমি দেখলাম, মটর ক্ষেতের লাল শাড়ি আর এ লাল শাড়ি আলাদা। নীল রঙের একটি জামা ওর কিশোরী গায়ে। চোখে পড়লো, ওর কপালেও লাল সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতেও তাই। তার মানে, বয়স দশ বারো যাই হোক, ও বিবাহিতা। কে ওর বর, ভরত নাকি? আমি বাঙলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি দেখতে পাওনি, আমি ওই ঘরের পেছনে বসেছিলাম?'

ঝুরি আমার দিকে না তাকিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়ে, ফিরে তাকালো। ওর মুখও তেলতেলে। মাথায় আবার একটা এবড়ো খেবড়ো খোঁপাও বেঁধেছে। খোঁপার বিনুনির বুনট বড় শিথিল। কাঁটাগুলো ভালো করে গোঁজা হয়নি। হয়তো কেশ সজ্জায় তেমন নিপুণ না। ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে, বয়সটা নির্ঘাৎ অনুমান করতে না পারলেও, দেখতে পাচ্ছি ও যেন চিত ফাল্গুনের গঙ্গা। শরীরের কূলে কূলে আষাঢ় শাঁওনের অপেক্ষা, কিন্তু লক্ষণ এখনও অস্পষ্ট। ও ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকালো, তারপরে দুই বহুড়ির দিকে। তাকাতেই ওর লাল কৃষ্ণকলি ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দেখা গেল। নিঃশব্দে কেবল মাথা নেড়ে, আস্তে আস্তে কয়েক পা সরে গেল। তারপরেই এক দৌড়ে, দক্ষিণের চালা-গুলোর আড়ালে।

আমি হতাশ অসহায় চোখে আবার মাঝবয়সী বহুড়ির দিকে তাকালাম। সে তখন যোবতী বহুড়ির দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। জানি না, ইশারায় কোনো কথা হচ্ছিল কী না। যোবতী বহুড়ির শরীরে যেন আচমকা মাঝ গঙ্গার ঘূর্ণী লেগে গেল। খিলখিল হেসে পিছন ফিরে চলে গেল আড়ালে। সঙ্গে নেংটিটাও। ইতিমধ্যে কখন পাহারাদার সারমেয় আমার কাছে এসে গা শুঁকতে আরম্ভ করেছে।

নানী বললো, 'বৈঠ হো রউয়া।'

বসা আমার মাথায় উঠেছে। এদিকে গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে মনে বুঝতে পারছি, ভরতরা না ফিরে এলে, পুব পশ্চিম কোনো কূলেই আপাতত যাওয়া সম্ভব না। কুতু বটারা আসবে রাত্রের খাওয়া সেরে। সে আগমন কখন ঘটবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময় জানি না। সন্ধ্যের পরে এক ঘুম দিয়েও আসতে পারে। কারণ এই ভাঁটা যাবে, তারপরে জোয়ার। জোয়ার শেষ হবে মাঝ রাত্রি ছাড়িয়ে। শেষ রাত্রে জাল টানা। এসব তাদের নিজেদের মুখের কথা।

বুঝতে পারছি, ছটফটিয়ে লাভ নেই। অতএব খাটিয়ায় বসে নানীকে বললাম, 'থোড়া পানি পিয়েগা।'

'হঁ হঁ, কাহে না পিবে বাবা।' নানী বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে মাঝবয়সীকে বললো, 'যা বেটি বাবাকে তানি পানি পিয়ে দে।'

মাঝবয়সী তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেল। মাঝবয়সী বলছি বটে, কেন না তার মুখে কিছুটা বয়সের ছাপ পড়েছে। কিন্তু গোটা শরীরে একটুও টোল টাল খায়নি। ছিপছিপে না, গড়নটাই তার চওড়া। মেদের চিহ্ন নেই। আমি আমার হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বেটি তুমকো কৌন লাগতা?'

নানী হুঁকা টানবার উদ্যোগ করছিল। মুখের কাছে হুঁকাটা তুলেও সরিয়ে নিয়ে হেসে বললো, 'বেটি না জানত কা বাবা? ও হমারি অপ্পন বেটি ভইলি, ভরত কো মা। ভরত কো বাপুকো দেখল বা কি?'

আমার হিন্দি জবাবের অর্থ করলে দাঁড়ায়, 'চরে যখন এলাম, তখন তোমার বেটি একজনের সঙ্গে আলু তুলছিল।'

'হঁ হঁ, ও হমারি দামাদ ভইল।' নানী বললো, 'ভরতকে বাপু। অর ভরতকে জরু দেখলবানি কি বাবা?'

আমি বললাম, 'ভরতের জরু কি মুরি নাকি?'

'হায় রাম।' নানী কেসো গলায় খক খক করে হেসে উঠলো, 'মুরি ভরতকে ছোটা বহিন ভইলি। ছোটা এক লোকা না দেখল বা কি বাবা, অবহি তো ইহ পর আপন মায়ীকে খাড়া রহল বা। ওহি হনো ভরতকে জরু বেটা।'

নানীর কথা শেষ হবার আগেই ভরতের মা চালার পিছন থেকে সামনে এলো। ডান হাতে একটি ঝকঝকে পিতলের ঘটি, বাম হাতে এনামেলের একটি গেলাস। তার ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসি। আগেই তার খিলখিল হাসি শুনে বুঝেছি, ঠোঁটের হাসিটি কৌতুকের।

একটু যদি বা লজ্জার লেশ থেকেও থাকে, চলায় কাজে সহজ আর অনায়াস। আমার দিকে বাঁ হাত বাড়িয়ে গেলাসটা এগিয়ে দিল। আমি হাতে গেলাস নেবার পরে, সে যখন ঘটি থেকে জল ঢাললো আমার নজর চোখা হলো। কিন্তু তার দরকার ছিল না। ঘটির জল যে কলের পানি, দেখেই বোঝা গেল। চুমুক দিয়ে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পর পর দু-গেলাস জল পানের পরে আর একটু জল নিয়ে মুখে বুলিয়ে নিলাম।

জলের ছোঁয়ায় আরাম লাগলো কিন্তু ঠাণ্ডাও লাগলো। সূর্য ডুবে গিয়েছে, এখন প্রাক সন্ধ্যার ধূসর আলো। মাঘের রোদে তাত ছিল বটে। মাঝ গঙ্গার চরে এখন ঠাণ্ডায় যেন গা শিরশির করছে। ভরতের মা আমার হাত থেকে গেলাস নিয়ে চলে গেল। নানী হুঁকা টানছে ভুড়ুক ভুড়ুক। কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। আগুন নিভেছে, অথবা তামাক খতম হয়েছে। আমি চাদরটার ভাঁজ খুলে গলায় বুকে জড়ালাম। কাকের দল এপার ওপার করছে। নিশ্চয় যে যার বাড়ি ফিরছে। দূরের উত্তরে ডানলপের খেয়াঘাটের নৌকা পারাপার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জানি, উত্তরের সীমানায় গিয়ে ডাকলেও তারা শুনতে পাবে না। হাতের ইশারা যদি বা দেখতে পায়, চড়ায় আসবে কী না সন্দেহ। আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। মনে পড়লো, নৌকায় সিগারেট দেখে, নানীর ব্যগ্র ব্যাকুল হাত বাড়ানো। এখনো কয়েকটি প্যাকেট পকেটে আছে। নেশার ভাণ্ডার পূর্ণ রাখাটাও আমার একটা নেশা। এটা আমার অভিজ্ঞতার ফল। সময়ে অসময়ে বড় বেকায়দায় পড়ে যেতে হয়। অতএব এখনো নানীকে দু-একটা সিগারেট দান করতে আমার কৃপণ হওয়ার দরকার নেই। বললাম, 'নানী, সিগারেট চলবে?'

নানী বাঁ হাতে ডান হাতের হুঁকা মুখ থেকে সরিয়ে বাঁ হাতে নিল। মুখে অনেকগুলো ভাঁজ ফুটিয়ে ভুট্টা দানা ঝলসানো দাঁত

দেখিয়ে হাত বাড়ালো, 'ইঁহা দে রউয়া। দুপহর মে ভাত খায়ি তুমুকে সিগ্রেট পিলেবানি। দুলারি পি লেলি।'

আমার খাটিয়া থেকে নানীর দূরত্ব কয়েক হাত। অতএব আমিই উঠে এগিয়ে গিয়ে নানীকে সিগারেট দিলাম, আর তখনই চোখে পড়ে গেল পিছনের চালার আড়ালে নুরি এদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি দক্ষিণে পা বাড়ালো। ওর সঙ্গে নেংটিটাও ছিল। সেও দৌড় দিল। এই প্রথম দেখলাম নেংটিটার গায়ে একটা কাপড় জড়িয়ে গলার পিছনে আলগা গিঠ দিয়ে দিয়েছে। তলার নেংটিটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আমি নানীর কাছে গিয়ে তার হাতে সিগারেট দিলাম। তার মুখের হাসিটি আরও বিস্তৃত হলো। নৌকার মতনই সিগারেটটা নাকের কাছে ধরে নিঃশ্বাস টেনে বললো, 'বাবু, বাস্ বহুত আচ্ছা ভইল বা।'

আমি নিজের সিগারেট ধরিয়ে কাঠির আগুন নানীর মুখের কাছে ধরলাম। নানীর সেই একই রা, 'রহে দে বাবা, বাদমে পিওব। রাতে দো খানা খায়ি 'পর ই চিস পিওব।'

আমি আর একটা সিগারেট বের করে নানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তা হলে আর একটা রেখে দাও, ওটা এখন পিয়ে নাও।'

স্মর্তব্য, আমি আমার শিল্পাঞ্চলের বাজারি হিন্দিই চালিয়ে যাচ্ছি। নানী একেবারে বিগলিত, তবু বললো, 'এ রউয়া, তোহার কমতি হো যাইব।'

বললাম, 'আমার এখনও বহুত আছে। কমতি হলে তোমার হুঁকো টানবো।'

নানী এবার কেসো গলায় খলখলিয়ে হেসে উঠলো। 'হায় রাম, তু চিলম পিবে বাবা?'

নানীর কথার সঙ্গে সঙ্গেই, ঠিনঠিনে হাসির শব্দে মুখ তুলে দেখলাম, চালার পশ্চিম গায়ে দাঁড়িয়ে ভরতের বউ হাসছে। তার

শাশুড়ি দুলারিও দক্ষিণের আড়াল থেকে এগিয়ে এলো। চোখে তার জিজ্ঞাসা। নানী তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'বাবা কহতানি কি চিলম পিবে। দো সিগ্রেট হাম দেওবানি।' সে ডান হাতে একটি সিগারেট তুলে দেখালো। তারপরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আর একটা সিগারেটও নিল। হুঁকাটা বাড়িয়ে দিল ভরতের বউয়ের দিকে। বাঁ হাতে একটা সিগারেট নিয়ে ডান হাতে আর একটা ঠোঁটের কাছে ধরে, আমাকে বললো, 'দে বাবা, সলাই জ্বালা দে।'

আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, এগিয়ে ধরলাম। নানী ঠোঁট ছুঁচলো করে সিগারেট ধরালো, জোরে টান দিল। কাসতে আরম্ভ করলো খক খক করে। তার মধ্যে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'জেরা কড়া বা।'

কথার মধ্যেই ঠোঁটের কষে লাল গড়িয়ে এলো, সিগারেটের গোড়া ভিজে জবজবে হয়ে গেল। দুলারি বলে উঠলো, 'কড়া বা তো কাহে পিইতানি ?'

'চিজ বহুত বঢ়িয়া বা।' নানী বললো দুলারির দিকে হাত বাড়িয়ে, 'লে, তু পি।'

দুলারি হেসে উঠে লজ্জায় চালার আড়ালে চলে গেল। ভরতের বউও হাসতে হাসতে হুঁকা নিয়ে শাশুড়ির অনুসরণ করলো। নানী হেসে বললো, 'সরম ভইল।'

আমি ফিরে আবার খাটিয়ায় বসতে গেলাম। দেখলাম, নুরি চালা ঘরের পুব দিকে দাঁড়িয়ে আছে। পুব দিকেও একটি চালা ঘর। দু পাশে দুই চালা, মাঝখানে চলাফেরা, ঘরকন্নার কাজের জায়গা। নৌকো থেকে প্রথম নেমে মনে হয়েছিল, এক আধটি চালা না, দক্ষিণের সীমানায় যেন অনেকগুলো ঘর নিয়ে একটি পাড়া। আসলে সাকুল্যে খড়ের দোচালায় চাল জুড়ে তিনটি ঘর। ঘর কয়টির পিছনে সেই ঝাড়ালো গাছটি।

আমি সিগারেট ধরালাম। মুরি এবার আমাকে দেখা মাত্রই চলে গেল না। নীচু চালার ওপর দিয়ে, ও পুব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। নেংটিটা ওর গায়ের কাছে। মুরির নিশ্চলতাই বোধহয় ওকে সাহস জুগিয়েছে। কালো চোখে প্যাট প্যাট করে আমাকে দেখছে। চোখাচোখি হলেই, চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যার ধূসরতায় দ্রুত রাত্রের অন্ধকার নামছে। আমি সিগারেট ধরিয়ে টান দিলাম। এত দিনের হাতছানি, আর এতদিনের চরে আসার সাধ, সবই এখন আমাকে অন্ধ পাখি করে তুলছে। এপারে ওপারে জ্বলে উঠেছে বিজলি বাতি। এতক্ষণ মূলের কূলের যে-শব্দগুলো পাইনি, সেই ভারি যানবাহনের শব্দ স্পষ্ট ভেসে আসছে চরের বুকে। এখন এক চিন্তা, ভরত কখন আসবে।

এই উদ্বিগ্ন চিন্তার মধ্যেও, একটা জিনিসের অভাবে গোটা শরীর মনটাই যেন আনচান করছে। জিনিসটির নাম চা। সেই দ্বিপ্রহরেই একবার চা চা-প্রাণ চাচিয়ে উঠেছিল। কিন্তু চরে আসার নতুন স্বাদটা প্রাণটাকে আথে ব্যথে আকুল করেনি। এখন চায়ের কথা মনে হতেই, মূলের কূলের টানটা যেন শতেক গুণে বেড়ে গেল। এরা কি চা খায় না? শহরের সঙ্গে যাদের রোজ পেট খ্যাটের লেনাদেনা, চায়ে কি তাদের বিরাগ থাকতে পারে? শহরের বাজারে গঞ্জে বেচা কেনা করতে যায়, আবার সিনিমা উনিমাও দেখতে যায়, চা কেন খাবে না?

এ হলো আমার যুক্তি। এ চরের সংসারের পান ভোজনের হালচাল আমার জানা নেই। তা না হয় না-ই বা হলো। শহুরে ভদ্রলোকের আস্তানায় বসে নেই তো। বসে আছি চরে, চারদিকে জল। একটা যাত্রা ভঙ্গ করে হাজির হয়েছি। আমার ভরত পাটনী এলেই আবার চলে যাবো। জিজ্ঞেস করতে আপত্তি কি, চায়ের ব্যবস্থা আছে কী না? আমি একবার দেখলাম মুরির দিকে। এখন

ওকে ঈষৎ আবছা দেখাচ্ছে। নানীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'নানী তোমরা চা খাও না?'

'কাঁহে না পিওব হো রউয়া?' সঙ্গে সঙ্গে নানীর পালটা জবাব, 'বোলত কাঁহে না বাবা?' বলেই সে এক হাঁক দিল, 'এ ভরতকে মায়ী, এ দুলারি।'

নানীর ডাকের মধ্যেই দেখলাম, মুরি দুই চালার মাঝখান দিয়ে দক্ষিণে চলে গেল। নেংটিটাও সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে নানীর চেহারা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার পাশ থেকেই স্বর শোনা গেল, 'কা কহতানি?'

'কে বা? মনিয়া?' নানী জিজ্ঞেস করলো।

রমণী স্বরের জবাব শোনা গেল, 'হুঁ।'

'বাবা হমলোগনকে মেহমান বা। তানি চায়ে পিলাই দে।' নানী বললো।

স্বর শোনা গেল, 'বনাইল যাই। মাতারি কহেলে কি বহাবে ঠাণ্ডা হাওয়া দেতানি। বাবুকো ঘরে কাঁহে না লেয়ি যাতানি?'

'হঁ, সচ কহলে তু, হমে ভি জারা লাগতানি।' নানীর আবছা মূর্তির মুখ আমার দিকে ফিরলো, বললো, 'এ রউয়া ঘরে পর চল বাবা।'

এ বড় ব্যাজ। ঘরে কেন? খোলা আকাশের নীচে চরের বুকে, এই তো বেশ ভালো বসেছি, এমন বসা আর কোনদিন হবে কী না কে জানে? আকাশে একটি করে তারা ফুটছে। কোন পক্ষ চলছে জানি না। নীল আকাশ ক্রমে এখন কৃষ্ণকালো। তারাগুলো ফুটছে যেন হলুদ কৃষ্ণকলির ঝাড়ের ফুলের মতন। পুব দিগন্তের কোথাও আলোর ইশারা নেই। দেখে শুনে তাই মনে হচ্ছে, কৃষ্ণপক্ষ চলছে। আমি নানীকে বললাম, 'তুমি যাও, আমি একটু বাইরেই বসি।'

নানীর কাছাকাছি থেকেই রমণী স্বরে ঈষৎ হাস্য শোনা গেল,

তারপরে বাত, 'শহর মোকমবালা বাবু, কেইসান ই ঝোপড়ি 'পরে বৈঠলবে হুই নানী ?'

এবার বোঝা গেল, বাত দিচ্ছে ভরতের বউ, নাম তার মনিয়া। মায়েব নাম ত্বলারি, মেয়ের নাম মুরি। পুত্রবধূর নাম মনিয়া। যতোদূর জানি, মানিয়া বাঙলা ভাষার ময়না ত্বলারি কি ত্বলালী ? মুরি নাম জীবনে কখনো শুনিনি। নানী বলেলো, 'হুঁ, তু সচ কহলবাজি, মগর এ জারা মে কৈসান বৈঠল যাওত ? এ রউয়া, তানি ভখ'লিয় লে বাবা, ঘরে 'পর চল।'

'কমসে কম, উ বগলে পর চুলাহ নজদিক আওত কাঁহে না ?' এবার সামনের তুই চালার মাঝখান থেকে নতুন স্বরে শোনা গেল। এ স্বর নিশ্চয়ই মুরিব, এবং এই ওর প্রথম বাণী।

নানী বলে উঠলো, 'হ হ, চুলহাকে আগমে জারা কমতি লাগতেনি। চল বাবা ঘরকে পিছে চল।'

নানীর ছায়া মূর্তিকে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম। আমি তাকেই অনুসরণ করতে যাচ্ছিলাম। মুরি বলে উঠলো, 'ই বগলমে কাঁহে না আওত ?'

অন্ধকারে এখন আর স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, মুরির মুখ কোন দিকে। কাকে বলছে ? আমি নানীর দিকে দেখলাম : .স পশ্চিমের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই চোখে পড়লো, তুই চালার মাঝখানের বাঁ দিকে আগুনের শিখার আলো কাঁপছে। তুই চালার মাঝখানে, কাছাকাছি মুরির অবয়বটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এমন কি, ও যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, সেটাও এখন স্পষ্ট। এবার ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমাকে বললে ?'

'না তো কেকারে ?' মুরিও যেন এবার কৌতুকে ঈষৎ হেসে বাজলো।

এদের কথার সবই স্পষ্ট, কেবল, সব কথাতেই জিজ্ঞাসার সুর।

আমি খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের এদিকটায় এমন কিছু এবড়ো খেবড়ো না। আমি পা বাড়াতেই মুরি এগিয়ে গেল। আমি ওকে অনুসরণ করে, ঘরের পিছনে, প্রায় সেই ঝাড়ালো গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পশ্চিমের চালা ঘরটা লম্বা। পুবের দিকে পাশাপাশি ঘর দুটো, মাপে পশ্চিমের ঘরের সমান। আসলে, ইতিমধ্যে উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস কিঞ্চিৎ বইতে আরম্ভ করেছিল। দক্ষিণে, ঘরের আড়ালে এসেই সেটা টের পাওয়া গেল। ঝাড়ালো গাছটা যে কী গাছ, এখনও বুঝতে পারিনি। তার ওপর ডালের পাতায় হালকা বাতাসের কাঁপন। কিন্তু আমাদের গায়ে লাগছে না।

দেখলাম, চালা ঘর আর গাছের মাঝামাঝি জায়গায়, মাটির গড়া কাঠের উনোন। দুলারি ইতিমধ্যেই কাঠের আগুন উসকে তুলেছে। নানী গিয়ে বসেছে উনোনের ধার ঘেঁষে। তার পাশে ভরতের নেংটিটা, গোটা গায়ে কাপড় জড়ানো একটা পুতুলের মতন। চালা ঘরের দক্ষিণের দরজা দিয়ে, মনিয়া যাতায়াত করছে, আর শাশুড়িকে নানান কিছু যোগান দিচ্ছে। মুরি একটা চটের বস্তা, আসন হিসাবে পেতে দিল নানীর পাশে। তারপরে আমার দিকে তাকালো।

তাকানোর ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হলো না। আমি নানীর পাশে গিয়ে চটের বস্তায় বসলাম। দুলারি বোধহয় খেয়াল করেনি। তার মুখে তখনও শাশুড়ির প্রসাদ সিগারেটের শেষাংশ ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই, ঝটতি শেষ টান দিয়ে, ফেলে দিল উনোনের মধ্যে। আর আমিও খেয়াল করিনি, প্রায় আমার গায়ের কাছেই, গুটিশুটি হয়ে অত্যন্ত নিরীহভাবে চৌকিদার শুয়ে আছে।

চরের বুকে এমন একটি অসময়ের কথা কোনদিন ভাবতে পারিনি। তাও আবার অনেক দিনের অনেক বারের দেখা চর, যেন এক নতুন সময় আর ছবিকে হাজির করে দিল। মূলের কূলে যাবার উদ্বেগটা সাময়িক ভাবে ভুলেই গেলাম। আমাদের সকলের গায়েই লাল

আগুনের শিখা কাঁপছে। দুলারি উনোনের চওড়া হা মুখে দুটো লোহার শিক বসিয়ে, তার ওপর চাপিয়েছে একটা এলুমিনিয়ামের ছোটখাটো হাঁড়ি। মনিয়া একটা টিনের গোল চাকতি এনে তার ওপরে ঢাকা দিয়ে দিল।

শাশুড়ি বউ কাজে ব্যস্ত। মুরি পুব দিকের ঘরের দক্ষিণ মুখো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। চালা ঘরের উত্তরে কোনো দরজা নেই। দক্ষিণ মুখো যে দরজা আছে, উত্তর থেকে তা দেখা যায় না। আশেপাশেব খানিকটা সীমানা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রীতিমতো লেপামোছা। তার মানে, এই দ্বৈপায়নদের ঘরকন্নাটা এদিকেই। উনোন একটা জ্বলছে বটে। দু হাত ফারাকে আর একটা উনোনও রয়েছে।

কিন্তু আমার আন্দাজে বিস্তর ভুল। ভেবেছিলাম, চালাঘরগুলো চরের একেবারে দক্ষিণ সীমানায়। তারপরেই বালুর নীচে জলের স্রোত। আসলে, ঝাড়ালো গাছটা ছাড়িয়েও, প্রায় পনর বিশ হাত জায়গা। স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, উনোনের আগুনের আলোয় দেখতে পাচ্ছি, ওদিকের জমিও খালি নেই। কোনো কিছুর চাষ করা হয়েছে।

'এ রউয়া তোহার ঘর কহাঁ বা?' নানী চুপ করে থাকতে পারে না।

বললাম, 'কাছেই।'

বলে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, সকলের দৃষ্টি আমার দিকে। স্বাভাবিক, দৃষ্টিতে তাদের কৌতূহল। কিন্তু আমার হিন্দি ভাষার 'নজদিক মে' মানে কী? কাছে বলতে তো অনেক জায়গাই বোঝায়। দুলারি অনায়াসেই উনোনের ওপর থেকে এলুমিনিয়ামের হাঁড়িটা নামিয়ে, মুখ ফিরিয়ে তাকালো মনিয়ার দিকে। শাশুড়ি বউ দুজনেই হাসলো। মুরির দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ও ঠোঁট টিপে রয়েছে।

নানী বললো, 'নজদিক ন সামঝাইলে বাবা, পূরব না পশ্চিম? শাগঞ্জ' না, হালিশহর?'

বললাম, 'আরও দক্ষিণে।'

এবার মনিয়া হেসে উঠে চালার মধ্যে চলে গেল। নুরি পুবের ঘরের দরজা ছেড়ে পশ্চিমের ঘরে মনিয়ার কাছে কাছে চলে গেল। দুলারি হাঁড়ির টিনের চাকতির ঢাকনা খুলে, একটা কৌটা খুলে, আগে গুঁড়ো চা ছুঁড়ে দিল। আর এক কৌটা খুলে, ভিতরে হাত ঢুকিয়ে তুলে আনলো, চিনি না, বড় এক টুকরো ভেলি গুড়। ছোট একটি এনামেলের বাটি থেকে অল্প কিছু দুধ। সবই করলো চোখের পলকে, এবং আবার ঢাকা দিল টিনের চাকতি দিয়ে। তারপরে একবার আমার দিকে দেখে নানীকে বললো, 'তোহার বাবা আপন ঘরেকো ঠিকানা বোলত না চাহে হাই মাতারি।'

নানী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আগুনের লাল আলোয়, বুড়ির মুখের ভাঁজগুলো গাঢ় দেখাচ্ছে। যেন মুখটাই বদলে গিয়েছে। বললো, 'কাঁহে হো রউয়া, তোহার মোকাম হম ছিন লিইব কি?'

আমি হাসলাম, বললাম, 'ছিনিয়ে নেবার মতন আমার মোকাম নেই নানী।'

'শাদী উদি করলেবানি না কা?' নানী আবার জিজ্ঞেস করলো।

দুলারি তাকিয়েছিল আমার দিকে। পশ্চিমের ঘরের দরজায় মনিয়া আর নুরির মুখ এক সঙ্গে উঁকি দিল। এ জবাবটা শোনবার কৌতূহলের মাত্রা কিছু বেশি। আমি বললাম, 'সাদী তো সব পুরুষই করে নানী, সেটা এমন আর কী কথা?'

দুলারি একেবারে বালিকার মতন হেসে উঠলো। মাঝ গঙ্গার চরের বুকে, কাঠের আগুনের লাল আলোয়, ভরতের মাকে যেন এক আশ্চর্য অলৌকিক নারী মূর্তি বলে মনে হলো। এখনো তার কালো চোখে

মেঘ বিজলীর খেলা আছে। সে হাসতে হাসতেই একবার আমাকে দেখে নিয়ে, একটা এলুমিনিয়ামের গেলাস কাছে টেনে নিল। গেলাসের মুখে প্রায় একটি খয়েরি রঙের কাপড়ের টুকরো চাপা দিল। বোধহয় চা ছেঁকে ছেঁকেই কাপড়ের টুকরোর রঙ এরকম দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া চায়ের সঙ্গে ভেলি গুড়ের ছোপ লেগে, রঙ গাঢ়তর হয়েছে।

ভেলি গুড় কেন, চিনি নেই কেন, এসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এমন নয় যে জীবনে এই প্রথম গুড়ের চা হতে দেখছি, বা এই প্রথম খেতে চলেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণার দায় কোনোকালে সাধের ইচ্ছা পূরণের মুখ চায় না। এতাবতকাল দেখে এলাম পান ভোজন, যখন যেমন, তখন তেমন। কিন্তু আপাতত ব্যাপার ভিন্ন। নানী আমার বাজারি হিন্দি বাত শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তু কা কহলেবাড়ে, হমে সমঝসে না আইলান হো বাবা। মরদকে সাদ্দী কা কুছ ছোটা বাত বা ?'

তুলারি মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালো মনিয়া আর নুরির দিকে। মনিয়া হেসে উঠলো। নুরির কিশোরী মুখে বিভ্রান্ত কৌতূহল। হাসতে গিয়ে ওর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে। তুলারি বললো, 'এ মাতারি, বাঙালী বাবুকে বদন না দেখল ? বাবু মরদ লোগনকে সাদী জায়দা উমরসে হোতানি। বাতেসে না সমঝাইলে কি ?' তুলারি একবার আমার মুখের দিকে দেখে, আবার অনায়াসেই গরম এলুমিনিয়ামের হাঁড়িটি তুলে, গেলাসের মুখে কাপড়ের টুকরোয় চা ছেঁকে ঢাললো।

তুলারি তার নিজের মতন একটা সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছে। নানী আমার মুখের দিকে তাকালো। যেন তুলারির কথা যাচাই করার জন্যই উনোনের আগুনের আলোয় আমার বদনটি দেখে নিচ্ছে। তার মুখেও আগুনের আলো কাঁপছে। লোমহীন ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে। মনিয়ার তেলতেলে মুখে হাসি, চোখে যেন সন্দিগ্ধ

কৌতূহল। ঝুরি মা ভউজীর মতন সাত সতরো ভাবতে শেখেনি। সে অবাক স্বরে বলে উঠলো, 'এততি উমরমে ইয়কো সাদী না ভইল ?'

'না ভইল তো কা ? তুহুকে দিল চাহতানি, কা ?' মনিয়া হেসে বেজে উঠলো।

ঝুরি হাত তুলে মনিয়াকে গুপ গুপ কিলিয়ে দিল পিঠে। ওর হাতের কাঁচের চুড়ি বেজে উঠলো ঠিনঠিনিয়ে। মনিয়া হাসতে হাসতে ছুটে চলে এলো দরজার বাইরে। ঝুরি চোখ ঘুরিয়ে এক পলক আমাকে দেখে, ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। নানীও কেসো গলায় খুক খুক করে হাসছে। ছুলারি এখন ঠোঁট টিপে হাসছে। গেলাসের মুখে চা ছাঁকার কাপড়টি নিংড়ে মনিয়াকে বললো, 'যা, বাবুকে চা দে।'

প্রায় যেন বাঙলা বুলি। মনিয়া ধূমায়িত এলুমিনিয়মের গেলাসটি তুলে আমার সামনে এনে বসিয়ে দিল। আমি তার মুখের দিকে দেখছি, সে দেখছে না। কিন্তু চোখে ঠোঁটে হাসি। কিশোরী ননদটির পিছনে লাগা কেন ? বুঝতে পারি, ঝুরি ওর বয়সোচিত সারল্যে, অবাক প্রশ্নটি করেছে। আমার মতন বয়সের পুরুষের বিয়ে হয়নি, একথাটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। ঠেকবারই কথা। ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। হয় তো ওর পাঁচ সাত বছরেই বিয়ের পাট চুকেছে। কেবল ওদের সমাজে না, বাঙলার তালুক মুলুকের খবর যারা রাখে, তারাও জানে, আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে এখনও সাত আট বছরের মেয়ে কপালে সিথি সিঁদুর পরে ঘরের আঙিনায় এক্কা দোক্কা খেলছে। স্বামীটি তার কোথায় তখন মাঠে ঘাটে গরু চরাচ্ছে কি হাল বলদ নিয়ে চাষে নেমেছে, সে খবর কে রাখে ? বে' হয়েছে তো হয়েছে, আমি আছি আমার মনে, তুমি থাকোগে তোমার মনে। সময় হলে, বাপ মায়ের মাথাব্যথা আগে। তখন নিজেরাই জামাইকে ডেকে মেয়েকে ঘাড়ে তুলে দেবে। শহরতলীর শিল্পাঞ্চলের কি কথা, খোদ কলকাতায়ও ঝুরির মতন কিশোরীকে আখছার দেখা যায়। সত্যি

মিথ্যা আলাদা, আমার বয়সী পুরুষকে যদি অবিবাহিত ভাবতে হয়, তা হলে মুরির মনে ধন্ধ লাগাটা অবাক হবার কিছু না।

ঘর গেরস্তি নিয়ে আমার জীব-করণ করম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে, মাঝ গঙ্গার এই চরে এখন আমার ভিন্ন পরিচয়। লম্বা চওড়া বাত দেবো না, যে 'আত্মানুসন্ধানে' বেরিয়েছি। কিন্তু ঘর ছাড়া এই 'আমি' আপনাতে আপনি আছি। একে যদি কেউ সুখ বলে, সেটা তার নিজের কথা। বিবাগী বললেও তাই। জীবনের নানা টানা-পোড়েনে, দুঃখ দৈন্যে বলতে পারো, এর নাম, 'মন ভাসির টান'। অনেকটা বানভাসির মতনই। দিনের পরে দিনে, শুকনো খাতের হাহাকারে প্লাবনের টানে ভেসে যাওয়া। বলতে পারো, 'বাঁচতে চাওয়া।' স্বস্তি হলো, ক্ষতি কারোর নেই।

আপাতত মন বিচারের হাকিমকে সেলাম। হাত বাড়ালাম ধূমায়িত এলুমিনিয়ামের গেলাসে। বাড়িয়েই যেন সাপের ছোবল খেলাম। এলুমিনিয়ামের গেলাস না, কাঠের আগুনের আংড়া যেন। মনিয়া তখন নানা আকারের পাত্র দুলারির দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল। আমার দুরবস্থা দেখেও তার হাসির ঝংকার শোনা গেল। দুলারির মুখেও হাসি। তবু যেন একটু গম্ভীর চালেই বললো, 'পাতিয়া উড়িয়া কাঁহে না কুছ দেইলে?'

পাতিয়া উড়িয়াটা কি বুঝতে পারলাম না। নানী তার গায়ের ময়লা চাদরের অংশবিশেষ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তোহার বাবু হাত হো রউয়া, এততি গরম পকাড়ে না সাকতবে। ইয়ে লে।'

আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে বললাম, 'এইটাতে কাজ হবে। কিন্তু পাতিয়া উড়িয়াটা কী?'

দুলারি তখন পাত্রে পাত্রে চা ঢালছে। হাসি মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'প্যাড়কে পাতিয়া হো জী।'

তার মানে গাছের পাতা? এটা একটা নতুন শিক্ষা। গরম পাত্র

ধরতে হলে, কিছু না পাও, গাছের পাতা জড়িয়ে ধরো। মনিয়া নানীর সামনে একটা ধূমায়িত চায়ের কলাইয়ের বাটি এগিয়ে দিল। নানী বললো, 'হুঁ, প্যাড়কে পাতিয়া হো বাবা। তু শহরকে বাবুলোগ ক্যায়সে জানলবে?' বলেও সে কিন্তু অনায়াসেই কলাইয়ের বাটি তুলে, ছুঁচলো ঠোঁট কানায় ছুঁইয়ে সুড়ুত করে চুমুক দিল।

কেন, ওদের হাত কি লোহায় গড়া? লোহাও তো তাতে। এদের হাত কি চরেব মাটি দিয়ে গড়া? নানীকে বাটিতে চুমুক দিতে দেখে নেংটিটা তার গায়ের কাছে আরও ঘনিয়ে বসলো। নিজের গোটা গা ঢাকা কাপড়ের ভিতর থেকে একটা হাত বের করে নানীর কোলে রাখলো। নানী বললো, 'সবুর যা বেটা, দেতানি!'

মনিয়া চালার দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'এ নুরি, চা পিয়ে যা।'

চালার ভিতর থেকে কোনো জবাব এলো না। দুলারি জ্বলন্ত কাঠ উনোনের ভিতর থেকে খানিকটা বাইরে টেনে নিয়ে এলো। তারপরে নিজের চায়ের বাটিতে চুমুক দিল। মনিয়া দুটো বাটি হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল। শীতে আমি তেমন কাবু না। কিন্তু ভেলি-গুড়ের স্বাদ গন্ধ যাই থাকুক, আর দুধের স্বাদ বলতে প্রায় কিছুই না থাক, এ গরম পানীয় এখন অমৃততুল্য। একা আমার না। নানী দুলারি, দুজনেরই দেখছি, মৌতাত জমেছে। জমেছে নেংটিটারও। সে মাঝে মাঝেই নানীর বাটিটা নিজের হাতে ধরে মুখের কাছে নামিয়ে চুমুক দিচ্ছে।

চালার ভিতর থেকে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। সঙ্গে হাসিরও। তারপরেই দেখি দুজনে দুজনের চায়ের বাটি হাতে নিয়ে চালার বাইরে এলো। মনিয়া একবার দেখলো আমার দিকে। তার চোখের তারায় ঠোঁটের কোণে হাসি। নুরিও মুখ ভার করে নেই। বরং কিশোরীর ঠোঁটে ঈষৎ সলজ্জ হাসির রেখা। দুজনেই দুলারির কাছাকাছি বসলো।

জ্বলন্ত কাঠের আগুনের শিখা একটু কমে গিয়েছে। আলোও কিছু কম। তবু প্রায় সকলের মুখই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'নুরির স্বামীও (মরদ শব্দ ব্যবহার করেছি) কি বাজারে গেছে?'

কথাটা সভার মাঝে পড়তেই, হঠাৎ যেন কেমন একটা স্তব্ধতা নেমে এলো। সকলের হাত মুখ নিশ্চল, চা পানেও ঠেক। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। হয় তো অনুচিত কৌতূহল প্রকাশ করেছি। কিন্তু অন্যায় কিছু ভেবে বলিনি। মনে এলো, জিজ্ঞেস করলাম।

প্রথমেই হেসে উঠলো মনিয়া। তারপরেই নুরি উঠে পড়বার উদ্যোগ করলো। মনিয়া ঝটিতি ওর হাত টেনে ধরলো। দুলারি বললো, 'ইয়ো মে সরম কা বাত কা বা? বৈঠ যা।'

নানী বললো, 'হ, সরম কা বাত কা বা? বাবা পুছলবানি, তোকার আদমি কহাঁ বা?'

'নুরিকে আদমি ইটাগড় 'পর আপন বাপ মাতারিকে সাথই রহতানি।' দুলারি বলল, 'ওহি 'পর চটকলমে কাম করতানি। আগাইলা ফাগুয়া বাদ গাওনা হওলবে, বাদে নুরি শশুরাল ঘর চল যাইব।'

তথাপিও দেখছি নুরি মনিয়ার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কিশোরী লজ্জা পেয়েছে। জানি না, আমার ওপর বিরক্তও হয়েছে কী না। দুলারি মনিয়াকে বললো, 'ছোড়ে দে বহু।'

মনিয়া ছেড়ে দিতেই নুরি এক ছুটে আবার ঘরের মধ্যে। নানী সস্নেহে হেসে বললো, 'সরম লাগল বা।'

নুরির মতন বয়সী মেয়ের স্বামীর প্রসঙ্গে বোধহয় লজ্জা পাবারই কথা। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা অনেকখানি আঁকাবাঁকা। নুরি চরের মেয়ে। ওর শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী থাকে ইটাগড়ে। অর্থাৎ টিটাগড়ে। আজ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু ছাড়া, কোনো হিন্দিভাষীর মুখে,

টিটাগড়কে ইটাগড় বলতে শুনিনি। শুধু এইটুকু জানি টিটাগড় আসল নামের মধ্যে নাকি একটা অশ্লীল শব্দ রয়েছে, যা মুখ ফুটে উচ্চারণ করা যায় না। কিন্তু চরের সঙ্গে মূলে কূলের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটলো কেমন করে?

এ আবার জিজ্ঞাসার কী আছে? অনুমান করেই নেওয়া যায়, দেশ ঘর ছেড়েও প্রবাসে নিজেদের সমাজ সভা থাকে। সামাজিকতার অসুবিধা কী? মেলাতে পারছি না যেটা, তা হলো, চবের মেয়ের বর কারখানার কর্মী। সেটাও আমার ভেবে লাভ নেই। মুলকি যোগাযোগের সূত্র একটা নিশ্চয় আছে। মনিয়া চায়ের বাটি রেখে উঠে দাঁড়ালো, দুলারির দিকে তাকিয়ে বললো, 'গাওনাকে মতলব বাবু সামঝাইলেন কি?'

কথাটা বলেই সে একবার আমার দিকে দেখে, নিজেও আবার চালার মধ্যে ঢুকে গেল। আমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম দুলারির দিকে। দুলারি আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। চোখে তার জিজ্ঞাসা। আমি বললাম, 'শুনেছি শাদীর পরে গাওনা হয়।'

দুলারি আর নানী এক সঙ্গে হেসে উঠলো। দুজনের দুই রকমের স্বর। দুলারি বললো, 'হ, ঠিক কহলেবারে বাবু, মগর সাদী হওত বচপনেমে, গাওনা হৎত লেড়কি যবে জোয়ান হোতি।'

'গাওনাকে আগে আদমিকে সাথ লেড়কিকে সুরত দেখ না পায়ে।' নানী আরও একটু ব্যাখ্যা করে বললো, 'তু বাঙালীকে এইসান বলতহি কি?'

জবাবটা কী দেবো, হঠাৎ ভেবে পেলাম না। গাওনার ব্যাখ্যাটা আমার একেবারেই যে অজানা, তা না। শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে বাস, বিহারের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা নেই, এমন না। সাদীর পরে গাওনা, আর সেটা যে গ্রাম বাঙলারও একরকমের সাবেকি প্রথা,

তাও জানি। বিবাহিতা বালিকাতে যখন রমণী লক্ষণ দেখা দেয়, তখন স্বামীর ডাক পড়ে। শাস্ত্রীয় ভাষায়, এর নাম দ্বিতীয় বিবাহ।

আমি নানীকে জবাব দিলাম, 'চলে, গাঁয়ে ঘরে, যেখানে বাচ্ছা মেয়েদের বিয়ে হয়।'

'হুঁ, গাঁওয়ে পর হওত, শহরবাবুকে ঘর না হওত।' তুলারি বললো।

তার কথা শেষ না হতেই, চালার ভিতর থেকে রমণী স্বরের গানের গুনগুনানি ভেসে এলো। গানের কথা একান্তই অস্পষ্ট, আমার পক্ষে বোঝাও মুসকিল। কেবল টুকরো কয়েকটি কথা কানে এলো, 'হোই লায়ে......নাচে বিচে......করত সিংহার......' এ গানে সুর আলাদা গায়কি আলাদা। বিহার অঞ্চলের বাঙলা প্রবাসীদের বিয়ের সময়, মেয়েদের গানের সুর অনেকটা এই রকম শুনেছি। তবে, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, গান গাইছে মনিয়া। তাকে বাধা দিচ্ছে সুরি। বোধহয় দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তিও চলছে, তার ফাঁকে ফাঁকে খিলখিল হাসির টুকরো। ননদ ভাজের রঙ্গ জমেছে ভালো।

এদিকে দেখছি, তুলারি আর নানীও নিজেদের মনেই হাসছে। গান শুনছে তারাও আর আমার থেকে বেশি উপভোগ করছে নিশ্চয়ই। কারণ তারা গানের ভাষা অনুসরণ করতে পারছে। নেংটিটা চৌকিদারের মতনই নানার কোলের কাছে গুটি-শুটি হয়ে পড়েছে।

চরের হাতছানিটাই দেখেছি এতোকাল। কোনো এক তারা ভরা মাঘের শেষের রাত্রে কলকল ছলছল জলের শব্দে, চরের এমন একটি অঙ্গনে এসে বসবো এমন কি আজ সকালেও ভাবিনি। কেউ বলেন, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। আমি ভাবি ধনাগারের অন্ধি-সন্ধি বেবাক ভিন চালে চলে। ছকের ঘরে তার গতাগতি মেলে না। যদি বেরিয়ে থাকি মনভাসির টানে, তবে মানতে হবে, জীবনের অলক্ষ্যেও এক দুরন্ত মাঝি বৈঠা রেখেছে তার হাতে। না হলে, চরের বুকে এ আসরে, কে আমাকে টেনে আনলো।......

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, আগে একটি নানীর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। নানী দেখে নিয়ে এই প্রথম আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'তুমি বাবা, হমে তানি চিলিম পিবে।'

দুলারি উঠে ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'বাবাকে লিতানি হোই মাতারি।'

দুলারি ঢুকলো ঘরের মধ্যে। কাঠের আগুন অনেকটাই ঝিমিয়ে গিয়েছে। তবু মনিয়া আর নুরিকে চালার বাইরে আসতে দেখলাম। ওরা দুজনেই এসে বসলো উনোনের কাছে, পাশাপাশি। মনিয়া কাঠটাকে ভিতরে খুঁচিয়ে, নেড়ে চেড়ে, আগুনের শিখা উসকে তুললো।

আমি সিগারেট ধরিয়ে, পাঞ্জাবীর হাতা সরিয়ে কবজির ঘড়ি দেখলাম। মাত্র সাতটা বেজে পাঁচ। মূলের দুই কূলে আলো। এখানে তার রেখা এসে পড়েনি। এ চরে মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যেই রাত গভীর। কথা না বললে, স্তব্ধ নিঝুম, কেবল ভাঁটার জলের ঢেউয়ের পাড়ের গায়ে ছলছলানি। শুনলে মনে হয়, বহুকালের যুগ যুগান্তের কতো কথা যেন বলে চলেছে।

'ঘড়িয়া কাঁহে দেখলবানি ছোট ভউজী।' নুরি বলে উঠলো মনিয়ার গায়ে খোঁচা দিয়ে। তার মধ্যেই একবার দেখে নিল আমার দিকে।

মনিয়া চোখ তুলে আমাকে একবার দেখলো, তারপর নুরির দিকে তাকিয়ে স্বরে ঢেউ দিয়ে বললো, 'হমে কাঁহে পুছতানি? হমারি হাতে পর কি ঘড়িয়া বা? হমে দেখতবানি কি?'

ননদ ভাজের তেলতেলে মুখে, আগুনের শিখার আলোয় চকচক করছে। সারা গায়ে কাঁপছে আগুনের শিখা। তাদের দুজনের কথাই বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি, ননদ ভাজের খুনসুটি ঝগড়ায় একটা

আপোষ বোধহয় হয়েছে। কিন্তু নুরির ভাষা ভাববাচ্যে কেন? খাটিয়া থেকে এখানে ডেকে এনে আসবার সময় তো সরাসরি কথাই হয়েছিল। হঠাৎ বিগড়ে গেল নাকি?

মনিয়াকে রীতিমতো তুষ্টু বলতে হয়। ঠোঁটের কোণের হাসিটি তার এমন স্থায়ী হয়েছে, কখন কোন কথায় খিলখিলিয়ে উঠবে, বোঝার উপায় নেই। চোখের উজ্জ্বল তারা তুটিতেও ঝিলিক লেগেই আছে। কিশোরী নুরির পাশে তাকে সব দিক থেকেই আলাদা দেখাচ্ছে। নুরির চোখে মুখে ক্ষণে হাসি, ক্ষণে ছায়া, ক্ষণে আবার আরও অবাক ভ্রূকুটি। এটি তার সারল্যেরই প্রমাণ। তুলনায় মনিয়ার কথায় চাতুরি, হাসিতে রহস্যের ছলনা। এসব হলো যোবতী বহুড়ির জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু তার মানে এই না, সে কুটিলা। নির্দোষ কপটতা আছে, কিন্তু তার নিজের মতন সব নিয়ে, সেও সরল। শরীরে তার যৌবনের উদ্ধত উচ্ছ্বাস। চলার ছন্দে কাব্যের ভাষায় বোধহয় মনিয়ার চলার দাপে 'দামিনী কাঁপে।' শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে আলু তোলার সময় একবারও তার চলন বলন চাউনি টের পাওয়া যায় নি।

সেই তুলনায় নুরি যেন সত্যি অবলা কিশোরী, কেবল তু চোখে অগাধ কৌতূহল। সেটাই স্বাভাবিক। ওর শরীরে মনে জোয়ারের প্রতীক্ষা। দেখলে মনে হয়, ওর মনে ও ধমনীতে সেই প্রতীক্ষা সুদূর সংকেত দিয়েছে। সেইজন্যই সহজে ও মুখ ফুটতে চায় না, অথচ ভাবে ভঙ্গিতে ও বড় হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু অনভিজ্ঞা কুমারীটি জীবনের বোধ থেকে বঞ্চিত না। অতএব ভউজীর ইশারা ইঙ্গিতে লজ্জা পায়, আর অনায়াসেই চিনিয়ে দেয়। অবিশ্যি জানি না, মনিয়া ননদিনীটিকে কিলিয়ে পাকাচ্ছে কীনা। কেন না, একটু আগেই চালার মধ্যে মনিয়ার গানের ভাষায় একটি কথা কানে ঠেকে আছে, 'করত সিংহার'। সেই সিংহার মানে কি শৃঙ্গার? তবে তো বিপদের

কথা। কিংবা এমনও হতে পারে, 'শৃঙ্গার' শব্দটি আমাদের ভাবনায় যতোটা সংকোচের ওদের ততোটা না।

এমন দাবী আমার পক্ষে সম্ভব না, আমি ওদের কথিত ভাষাকে যথাযথ রূপ দিতে পারছি। শিল্পাঞ্চলে আরও অনেক অবাঙালীর মুখেই এমন ভাষা শুনে থাকি আমার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ব্রজবুলি নিশ্চয়ই আলাদা ভাষা, বিহারের কোনো আঞ্চলিক ভাষা হওয়া সম্ভব না। তথাপি, ওদের কথাবার্তা যেন আমার কানে অনেকটা সেই জাতের। অতএব ওদের গানে শৃঙ্গার কথাটা হয়তো আখছার ব্যবহৃত হয়। দেশ, সমাজ, পরিবেশে, যে যার নিজের মতন। চিন্তা ভাবনা রুচি, কারো সঙ্গে কারো ছকে বাঁধা নেই।

'দরিয়াকে পানীয়ে 'পর তো গিরল না গেইলান।' নুরি কথাটা বলে একবার আমার দিকে দেখলো, তারপরে আবার মনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঘড়িয়া দেখনে কা জরুরত কা বা ?'

নুরির ভাববাচ্য ভাষা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ওর উদ্দিষ্ট লোকটি আমি, সন্দেহ নেই। আমি তো নদীর জলে পড়ে নেই, তবে ঘড়ি দেখবার দরকার কী ? নুরির এটাই প্রশ্ন। মনিয়ার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে তার উচ্ছুসিত হাসি চাপবার চেষ্টা করে, চোখের দৃষ্টি নুরির দিকে ফিরিয়ে বললো, 'যে ঘড়িয়া দখল হমি, উহুকে কাঁহে না পুছত ? হমে কা হাতে পর ঘড়িয়া বানলে বানি ?'

নুরি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো। কালো চোখে জিজ্ঞাসা। দেখে আমার হাসি পেলো। কিন্তু মুখে সিগারেট দিয়ে প্রায় হাত চাপা দিয়ে টান দিলাম, আর ঠোঁট ছুঁচলো করে ধোঁয়া ছাড়লাম কে জানে, হাসলে আবার কিশোরীটি কী বলে উঠবে, আমি তো দেখছি, যতো দোষ মনিয়ার। কৌতুকের ঝিলিক তার চোখে। হাসি চেপে নুরিকে উসকে দেবার চেষ্টা। তা ছাড়া, নুরিই বা আমার ঘড়ি দেখার ব্যাপারে এতোটা উত্ত্যক্ত কেন ?

নানী আমার পাশ থেকে বলে উঠলো, 'মুরি সচ্ কহলেবানি। তো দরিয়াকে পানীয়ে পর না গরল গেইলান হো বাবা? ইহ পর আদমিলোগন রহে না কি?'

সে-কথা কী করে অস্বীকার করি, এখানে মানুষ থাকে না? নদীর জলেও পড়িনি। বরং জীবনের এক অবিশ্বাস্য আসরে বসে আছি। ফেরার সময় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে, চরের এই রঙ্গ কৌতুকের আসরকে প্রাণ ভরে ভোগ করতে পারতাম। যাদের সঙ্গে অমিলের কথাই ভেবেছি, এখন দেখছি, তারা নিজে থেকেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মনে মনে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ করছি, তবু মন-ভাসির টানে ভেসেও, নিজেকে ভুলতে পারছি না। ভেসে যাবার টানের মধ্যেও, সংসারের নিয়ন্ত্রণটাকে একেবারে গোল্লায় পাঠানো যায় না। চেনা পরিচয়ের সময় সূত্র আর কতোটুকু?

তা ছাড়া সত্যি বলতে কি, চরের মরদ পুরুষরা ফিরে এলে, আমার উপস্থিতিটা তাদের চোখে কেমন ঠেকবে সেটাও মনের মধ্যে খচখচিয়ে উঠছে। রমণীর মন পাওয়া নাকি হাজার বছরের সাধনার ধন। এ ক্ষেত্রে মন না পেয়ে থাকি, আতিথ্য পেয়েছি। হয়তো অনাড়ম্বর, কিন্তু আন্তরিক অবিশ্রিই। যে-চর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে, এ আতিথ্য যেন তার আপন প্রকৃতিরই হাত দিয়ে এসেছে। কিন্তু দ্বৈপায়ন পুরুষরাও কি এই অচেনাকে তেমন হাত বাড়িয়ে দেবে? অবহেলা সইতে পারি, অসম্মানকে ভয়।

আমি নানীকে আমার মতন হিন্দিতে বাতলালাম, 'কিন্তু ফিরতে তো হবে নানী, কতো রাত হবে, তাই ভাবছি।'

'পলট কাঁহে চল যাওবেনি হোই নানী?' মুরি বলে উঠলো নানীর দিকে তাকিয়ে, 'এক রাত চরে পর রহল তো, শিব গোসা হো যাওবে কি?'

এতো দূর? আমি এক রাত চরে থাকলে কি শিব ঠাকুর গোসা

করবেন ? নুরি মনে মনে এতোটা এগিয়ে আছে, মূলে ভাবতে পারিনি। আর আমার মনের কথারই প্রতিধ্বনি করে যেন মনিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো। নুরি মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে মনিয়ার দিকে দেখলো, তারপরেই কাঁচের চুড়িতে আওয়াজ তুলে মারবার জন্য হাত তুললো।

মনিয়া তৎক্ষণাৎ পিছন দিকে খানিকটা এগিয়ে পড়ে হাত তুলে মার বাঁচালো, বললো, 'হমে কুছ না কহলবানি, হমে পর কাঁহে গোসসা ভইল ?'

নানী বললো, 'বাবা কয়সে হমলোগনকে সাথে ইঁহ পর রহবে ? শহরকে বাবু ভইল।'

নুরি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চোখে ওর ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। মনে কোনো জট জটিলতা নেই। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলো না। মনিয়া এক হাত দূরে সরে বসেছে। তার ঠোঁটের কোণে হাসির উচ্ছলতার রাশ টেনে ধরা। এই বোধহয় সে প্রথম সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হ, কাঁহে না রহল, যাই হো রউয়া ? সহরেকে বাবুলোগ, আওত, যাওত দিন ভর বহত খানাপিনা করত, তু কাঁহে না এহেবানি ?'

মনিয়া বাবুলোকদের বনভোজনের কথা বলছে। অথবা চর-ভোজনের। কিন্তু সেটা হলো দিনের বেলার ঘটনা। আমার মতন একলা সহরবাসী কি কখনো এই চরে রাত কাটিয়েছে ? আসলে মনিয়ার সবটাই ঠাট্টা। আমাকে না, নুরিকেই। কথার মধ্যে তার চোখের তারা ঘুরে ঘুরে নুরির দিকে দেখছিল। নুরিও বারেবারেই মনিয়ার মুখের দিকে দেখছে এবং ওর তেলতেলে মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠছে। মুনিয়ার ঠাট্টার মধ্যে ছলনা কতোটা আমিও অনুমানে অক্ষম। তার বুলিতে নুরি খুশি এটা স্পষ্ট।

আমি মনিয়ার দিকে তাকালাম। তার ভুরু কাঁপলো, না কপালের

লাল টিপ কাঁপল বুঝতে পারলাম না। অথবা চোখের কালো তারা দুটি। কিন্তু আমার জবাবের প্রত্যাশা তার চোখে। আমি বললাম, 'আমিও তো দিনভর রইলাম। রাতে কি করে থাকবো? বাবুলোক যারা আসে তারা কি রাতেও থাকে?'

'উলোগনকে সাথে ইয়কে কা বাত বা?' নুরি মনিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আমার সঙ্গে সেই বাবুলোকদের কী কথা? তা বটে। কিন্তু নুরি আমাকে এমন আলাদা করে দেখছে কেন? আমার বিপর্যয় দেখে? কিন্তু এমন বিপর্যয় তো ঘটে নি নিরুপায় হয়ে রাত্রিবাস করতেই হবে? নানী যেন ছেলেমানুষের কথায় হেসে উঠে আবার বলল, 'সহরকে বাবু ভইল না? তোকার এ ঝোপড়িয়ে পর কয়সে রহেবানি?'

নুরি আমার দিকে তাকালো। চোখে ওর জিজ্ঞাসা। অর্থও স্পষ্ট। কেন হে বাবু তুমি কি আমাদের এঘরে থাকতে পারবে না? জবাব তো আমার মুখের ডগায় আছে। চালা ঝোপড়ি কেন খোলা আকাশের তলেও অনেক জায়গায় অনেক রাত কেটেছে। সেই তুলনায় এই চরের ঘর তো স্বর্গ। কিন্তু এতোটা জবাব দিতে আমি সক্ষম না। মনিয়ার অপলক বিজলি হানা চোখের দিকে একবার দেখে আমি মুখ তুলে পশ্চিমের কূলে তাকালাম। এবং এই প্রথম আমার ঘ্রাণে তামাকের গন্ধ স্পষ্ট হলো।

অনুমানের প্রয়োজন নেই, দুলারি শাশুড়ির জন্য তামাক সেজে আগে নিজের মৌতাতটি সেরে নিচ্ছে। হয় তো বাইরে এসে উনোনের ধারে বসেই হুঁকা টানতে পারতো। কিন্তু বয়সটা এখনও বোধহয় সে পর্যায়ে পৌঁছয়নি, বাইরের অচেনা বাবুর সামনে বসে হুঁকা টানবে। এটা সহবত বা লজ্জা বুঝতে পারছি না। আমি না থাকলে যে শাশুড়ি বউ এক সঙ্গেই হুঁকা হাতাহাতি করতো তা দুলারিকে সিগারেট টানতে দেখেই টের পেয়েছিলাম।

শিল্পাঞ্চলে এটা একটা স্বাভাবিক দৃশ্য। নানী বা দুলালির মতন স্ত্রীলোকেরা ঘরের উঠোনে দরজায় বসে হুঁকা টানছে। এ বঙ্গে অল্প বিস্তর চোখে পড়েছে। কিন্তু ছেলেবেলায়, পূর্ববঙ্গে পাড়াগাঁয়ে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী বয়স্কা স্ত্রীলোকদের হুঁকা টানতে দেখেছি। ধাবমান কাল ভারতীয় জীবনের কতোটা লুটে পুটে, কতোটা নতুন দান দিয়েছে, হিসাবে আমার মন নেই। কেন না, ওসব তর্ক বড় খিটকেল ব্যাপার। কিন্তু নানী বা দুলালির মতন হাতের হুঁকা একেবারে লুটে নেয়নি। পথে চলতে বিড়ি চলে। সেটা তো এ চরে আসবার আগে নানীকেই দেখেছি।

তামাকের গন্ধ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হুঁকা হাতে দুলারি বেরিয়ে এলো। নানীর কাছে এগিয়ে এসে হুঁকা বাড়িয়ে দিল। জানি না, মনিয়ারও এই নেশাটা আছে কী-না। আমার অনুমান তার বয়স কুড়ি বাইশের বেশি না। বিহার বা উত্তরপ্রদেশে তার বয়সী মেয়ে বহুড়িকেও যে ধূমপান করতে দেখি নি, এমন না। কেবল বাবুদিগের বাড়ির বিবিদিগের সিগারেট পান দেখলেই, বাঙালী ভদ্রলোকদিগের সমাজ সংস্কৃতিতে নাভিশ্বাস ওঠে। ঘুরে ফিরে সেই সমাজ পরিবেশ রুচির কথা।

নানী ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকা টানছে। দুলারি ঘরের দিকে যেতে যেতে, মনিয়ার দিকে ফিরে বললো, 'কা ভইল বহু, আজ রাতমে খানা না পাকাওবে কি?'

মনিয়া তাড়াতাড়ি উঠে, আঁচল দিয়ে কোমরের পিছনে ধুলা ঝাড়া দিল। দেখলো একবার মুন্নির দিকে, ঘরের দিকে যেতে যেতে আমাকে। তার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই, মুন্নির সঙ্গে চোখাচোখি। এখনও যেন ওর চোখে সেই একই জিজ্ঞাসা, কিন্তু ও আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, 'কেকার বাতে পর তু রহলে সকত? ভউজী?'

প্রথমটা নুরির বাতপুছটা ধরতে পারিনি। পর মুহূর্তেই বুঝতে পেরে, হেসে উঠতে গেলাম। কিন্তু নিজেকে দমন করতে হলো। নুরির সরল জিজ্ঞাসার মধ্যে, একটা গুরুতর ইঙ্গিত আছে। এখন আর ভাববাচ্যে না, প্রশ্ন সরাসরি, 'কার কথায় তুমি থাকতে পারো, বউদির ?'

সারল্যের গুণ বলো, দোষ বলো, প্যাঁচ পয়জার নেই। বুকের কথা, অনায়াসেই মুখে ফোটে, কোথায় গিয়ে লাগবে, সে-খোঁজ সে করে না। নুরি কি মনিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবছে নাকি ? আমি হেসে বললাম, 'না আমি কারো কথায় আসিনি, কারো কথায় থাকবো কেন ? তোমার বাবা দাদারা এলেই আমি চলে যাবো।'

নুরি মুখ ফিরিয়ে তাকালো উনোনের দিকে। তারপরে হঠাৎ উঠে পড়ে চলে গেল পশ্চিমের চালার আড়ালে। ভেবেছিলাম, নানী ছিলম টানতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে হঠাৎ হেসে বলে উঠলো, 'অবতক ছোটি বালি বা।'

ছোটি বুঝলাম, বালি কী ? মনের জিজ্ঞাসা মনের অতলে ডুবে গেল। নুরি পশ্চিমের বেড়ার পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো, 'ছোটি বালি কি বুড়ি মাতারি ভইলি, কেকার কি বা ?'

নুরির অস্পষ্ট মুখ মুহূর্তেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। নানী আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসলো। কোনো কথা না বলে আবার ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে হুঁকা টানতে লাগলো। নুরির রাগটা কার ওপরে ? কিশোরীরা চিরদিনই অবুঝ। নাকি রমণী মাত্রেই ? এতোটা বলার দায়িত্ব নেবো না। ঝুঁকি আছে। কিন্তু নুরির রাগটা বোধহয় ঝিকে মেরে বউকে শেখানোর মতনই। অবুঝ কিশোরীটিকে আমার অবস্থা বোঝাবো কেমন করে ?

চালা থেকে বেরিয়ে এলো দুলারি। হাতে তার একটা মাঝারি. মাপের চ্যাঙারি। পিছনে এলো মনিয়া। তার দু হাতে ধরা কালা

উঁচু বেশ বড়সড় একখানি কাঠের পাত্র। কাছে আসতে দেখতে পেলাম, আটার পরিমাণ আমার চোখে পর্বত প্রমাণ। দুলারি উনোনের কাছাকাছি চ্যাঙাড়ি নিয়ে বসলো। দেখলাম, তাতে রয়েছে সবজী। আলু পেঁয়াজ ফুটে যাওয়া ফুলকপির ফাঁকে দু-একটা বেগুন আর বিলিতি বেগুনও যেন চোখে পড়লো। মনিয়া আটার পাত্র রেখে আবার ঢালার ভিতরে গেল। বেরিয়ে এলো একটি জলভরা বালতি আর পিত্তলের ঘটি নিয়ে। আটার পাত্রের সামনে বসে ঘটিতে জল তুলে, আটায় ঢাললো। দুলারি চ্যাঙাড়ির এক পাশ থেকে তুলে নিল, বেশ বড় একখানি হাতদায়ের মতন ছুরি। নেই কেবল কাঠের বাটালি।

এইখানে বঙ্গে বিহারে তফাৎ, বঁটির বদলে ছুরি। বঙ্গ রমণী হলে, একখানি বঁটি পেতে বসত, কেবল এই শিল্পাঞ্চলে না শিল্পাঞ্চলের বাজারে অবাঙালী মৎস্য বিক্রয়কারিণী ব্যতিরেকে। ওটা বোধহয় বাংলার বাজারি চল।

দুলারি আশেপাশে দেখে, মনিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নুরি কহাঁ গেলি ?'

মনিয়া দু হাতে আটা মাখতে মাখতে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। চোখে জিজ্ঞাসা। যেন আমিই জানি, নুরি কোথায় গিয়েছে। নানী মুখের কাছ থেকে হুঁকা সরিয়ে জবাব দিল, 'ওকার গোসসা ভইল। ইধর উধর কোই বগলে পরে গেলবানি।'

দুলারী হাতে তুলে নিল ছুরি, আলুর খোসা না ছাড়িয়ে ঝটিতি টুকরো করতে করতে আমার দিকে ফিরে একবার দেখলো। তারপরে মনিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আবার আমার দিকে, ফিরে বললো, 'কমসে কম গরীব ঘরকে রোটি তরকারি খা লেই যাওবেনি।'

আমি কী জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছি না। মনিয়া বললো, 'কাঁহে না ? সমুর পলটি আগে খানা বন যাইব।'

'সচ কহলেবানি।' নানী মুখের কাছ থেকে হুঁকা সরিয়ে বললো : আবার ভুড়ুক ভুড়ুক চললো।

কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু মনিয়ার কথা শুনে আমার উদ্বেগ বেড়ে গেল। তার শ্বশুর ফিরে আসার আগে রান্না হয়ে যাবে। তার মানে কী? ভরতদের ফিরে আসতে কতো দেরি হবে? আমি হেসে বললাম, 'কবে কোথায় কার ভাগ্যে খাবার তোলা থাকে, সেকথা কেউ বলতে পারে না। তোমাদের রোটি তরকারি আমি খেতে পেলে খুশি হবো। কিন্তু ফিরবো কখন? কত রাত হবে ভরতদের ফিরে আসতে?'

'কুছ না কহলে সকত বাবু।' দুলারি জবাব দিল আমার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ছুরি দিয়ে সব্জী কেটে চলেছে অনায়াসে। ওটা অভ্যাসের ফল। সে আবার বললো, 'তুরন্তে পলট আ সকত, দের ভি হো সকত। আদমিলোগন যবে বাজার যাতানি, কোই কুছ না কহ সকত। কলকে কাম তো না বা না?'

আদমিলোগন অর্থে পুরুষদের কথা বোঝাচ্ছে। তারা বাজারে গেলে কখন ফিরবে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। কল-কারখানার কাজ তো না? তার মানে, কল-কারখানার কাজে আদমিদের আসা-যাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে। এ কথাটা দুলারি ভালোই জানে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি। তুরন্তেই যেন তারা ফিরে আসে।

নানী আমাকে আবার বোঝালো, চিন্তার কিছু নেই, আমি তো দরিয়ার জলে পড়ে নেই? কথাটা কি সত্যি? হাতছানির ডাকে সাড়া দিয়ে এসে, এখন তো যেন মনে হচ্ছে, আমি অগাধ জলেই পড়েছি। নানীর সঙ্গে কথায় কথায় জানা গেল, এরা দ্বারভাঙা জেলার অধিবাসী। ভরতের বাবার নাম সিবন। অর্থাৎ শিব। ভরতের ছোট ভাইয়ের নাম গোবিন। কিন্তু চাচার কথা সে বললো।

না। আমাকেই জিজ্ঞেস করতে হলো, 'আর চাচার কথা যে শুনছিলাম, তার নাম কী ?'

নানী সহসা জবাব দিল না। আমি দুলারি আর মনিয়ার দিকে তাকালাম। শাশুড়ি বউ পরস্পরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করলো, কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিল না। আমি আবার নানীর দিকে ফিরে তাকালাম। নানী হুঁকাটা কোলের ওপর রেখে জবাব দিল। 'তু চাচাকে বাত শুনলেবানি, ওকার নাম রামাবতার। সিবনকে ভাই নহি, দোস্ত বা। আগে দুনো বাঁশবেড়িয়া চটকলেমে কাম করতানি। সিবন ছাটাই হো গেইলবানি। রামাবতারকে নোকরি আচ্ছা বা মগর উ ঠিক তরিকা পর কাম নহি কইলেবানি। সবহি দিল চাহতানি, এ চৌরে পর রহল যাওত। তো, কা বাবা, আপনে খুশি পর কি কুম্পানিকে নোকরি জীয়েতক রহবে ?'

নানীর স্বরে এই প্রথম যেন কিঞ্চিৎ অশান্তির সুর শোনা গেল। সত্যি এভাবে সারা জীবন কোম্পানীর নোকরি কি থাকে ? নানী তার ভাষায় আরও যা বললো, তা হলো, রামাবতারের জরু মারা গিয়েছে অনেককাল। তার কোনো বালবাচ্ছা হয়নি। তখন সিবন দুলারিকে নিয়ে রামাবতারের সঙ্গে, বাঁশবেড়ের এক বস্তিতেই থাকতো। সিবনের বাবা-মা এই চরে প্রথম এসেছিল। চাষবাস করতো, আর বর্ষাকালে ছেলের কাছে বস্তিতে গিয়ে থাকতো। নানী থাকতো তার নিজের ব্যাটার কাছে হাজিনগরে। কারণ, তার ব্যাটা হাজিনগরের মিলে কাজ করে। কিন্তু 'বেটয়োকে বহু' 'সাসুকে' দেখতে পারে না। নাতীরাও সেই রকমই। অতএব, নিজের বেটি দুলারির আশ্রয়েই তাকে আসতে হয়েছে।

উনোনের আগুনের আলো ছাড়া আলো নেই। ভাঁটার ঢেউয়ের ধাক্কায় চরের পাড়ে কেবল ছলছল কলকল শব্দ। মাঘের আকাশ শরতের মতন কৃষ্ণ, আর সেই কৃষ্ণ বাগিচায় অজস্র ফুলের মতন

নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। তার মাঝখানে নানীর জীবন কাহিনী, তার স্বরে শোনাচ্ছে যেন এক বিধবা বৃদ্ধার দুঃখ গাথার মতন।

'যব হরদেও বিমুখ হওত, তব জোয়ানীকে নাথ ছোড় যাতানি।' ...বিমুখ শব্দ অবাঙালীর মুখে এই প্রথম শুনলাম।

'যখন মহাদেব বিমুখ হন, তখন যুবতীর স্বামী তাকে ছেড়ে যায়।' নানীর একটি কথাতেই তার জীবনের সব দুঃখের কাহিনী স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভারতীয় জীবনের যে কোনো নারীর পক্ষেই বোধহয় এইটি চরম ব্যথা, লাঞ্ছনা আর অসম্মানের কথা।

নানীর সামান্য জীবনকাহিনীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই, রামাবতারের প্রসঙ্গও সে টেনে নিয়ে এলো। যাব জরু বাল-বাচ্ছা নেই, তার সব থেকেও কিছু নেই। বাঁশবেড়ের বস্তিতে তার ঘর আছে। কিন্তু সে এখান থেকেই কারখানায় যায়। বস্তির ঘরে থাকে না। খালি ঘরে একটা লোক থাকে কেমন করে? তবে হ্যাঁ, সে আর একবার শাদী করতে পারতো। সবাই তাকে বলেছে। সে করেনি। কেন করেনি? তা কে বলবে? রামাবতার শাদী না করায় কেউ খুশি হয়নি। নানীর পছন্দ না, সে এই চরে এসে পড়ে থাকে। কোনো রকমে নোকরিটা বজায় রেখেছে, তাও অনেক কামাই করে। আব গাঁজা ভাঙ মদ খায়।

নানী এই পর্যন্ত বলে থামলো। তাকালো দুলারির দিকে। মনিয়া বোধহয় কোনো কাজে চালার ভিতর গিয়েছে, লক্ষ্য করেনি। দুলারির তরকারি কোটা শেষ। নুরির এখনও পাত্তা নেই। নানী বললো, 'রামাবতারকে যারে হমে কুছ না কহতানি। হামকে বাতে পরে কেহুকে গোসসা লাগে কি দুখ পাওয়ে, ই না চাহতানি।'

নানী কথাগুলো বললো দুলারির দিকে তাকিয়ে, তারপরে দূরের পশ্চিমে। দুলারি যেন না তাকাবার ছলেই পলকে একবার আমাকে দেখে নিল। এখন তার মুখে হাসি নেই। রাগও নেই। একটু বা

গম্ভীর। সে উঠে চলে গেল চালার ভিতর। মুহূর্তেই নানী আমার হাঁটুর কাছে আঙুলের খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'বেটি হমারি জরু সিবনকে। অওরত আপনেকে বুঝ সমঝেবেনি তো কে সমঝাওবে?'

নানীর কথা শেষ হবার আগেই মনিয়া একটি ছোট চৌকা লণ্ঠন এক হাতে, অন্য হাতে দড়িতে ঝোলানো একটা চায়ের পেটির মতন কাঠের বাকস নিয়ে চালা থেকে বেরিয়ে এলো। নানী তৎক্ষণাৎ গলা খুলে যা বললো, তার অর্থ, ভরতও বাঁশবেড়ের চটকলে মাসে দু মাসে দু-তিন হপ্তা বদলি কাজ করে। বস্তিতে রামাবতারের ঘরের লাগোয়া। ভরত ওর বাপের ঘরটাই রেখে দিয়েছে। কেন না, সেই ঘরেই তো ভরতের জন্ম হয়েছে না?

নানীর হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন এবং আগের কথার খেই ধরতে আমাকে বেগ পেতে হলো। ভরত যে চটকলে বদলি কাজ করে, এ খবর নতুন। নতুন সবটাই। মুরির বিয়ের যোগসূত্র খুঁজে পেতে এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না। একদা সকলেরই লক্ষ্য ছিল, চটকলের কাজ। এখনও সে সম্পর্ক একেবারে ঘোচে নি। সিবন তার জীবন শুরু করেছিল চটকলে। চরে আসবার আগে হয় তো সিবনের বাবাও চটকলেই কাজ করতো। সিবন ছাঁটাই হয়ে চরে এসেছে, ভরত এখনও মাসে দু মাসে দু-তিন হপ্তা বদলি কাজ করে। বাঁশবেড়ের বস্তিতে ঘরও আছে। কিন্তু দুলারি উঠে যাবার পরেই, চুপিচুপি কথাগুলোর স্রোত কোন দিকে? দুলারি বসে থাকতেই বলেছিল। 'রামাবতারের ব্যাপারে সে কিছুই বলতে চায় না, কারণ তার কথায় কেউ রাগ করে বা দুঃখ পায়, সে চায় না।' এ কথা বলার আগে সে দুলারির দিকে একবার তাকিয়েছিল। তারপরে দুলারি ঘরে চলে যাবার পরেই, সেই চুপি চুপি কথা তাও আমার হাঁটুতে খোঁচা দিয়ে, 'দুলারি আমার বেটি, সিবনের বউ। স্ত্রীলোক নিজে বুঝে সমঝে না চললে কে তাকে বোঝাবে?'...

কী এর অর্থ? নিতান্ত হিং টিং ছট? সকলের অবর্তমানে, হঠাৎ নানী চুপি চুপি ধাঁধার কথা বলবে, এমন বৃদ্ধা সে না। জগত সংসারকে সে যুবতীকাল থেকে অনাথিনীর চোখে দেখে এসেছে। আমার মনে অকারণ ধন্দ ধরাবার পাত্রী সে না। প্রসঙ্গ ছিল রামাবতার। ঘোষিত নীতি কারোকে সে রামাবতারের কথা বলে দুঃখ দিতে চায় না। তারপরেই ঝটিতি চুপি চুপি দুলারির বুঝে-সমঝে চলার কথা। কথা নাকি ষোল ধারায় বহে। এ কোন ধারায় বইছে?

ধারাটা এমন কিছু অস্পষ্ট না। কথার ধারায় পরকীয়া প্রেমের ছটা চাপা নেই। একমাত্র রামাবতারকেই চোখে দেখিনি, আর আর সবাইকেই দেখেছি। আমার কানে আরো বাজছে, 'সিবন আর রামাবতার দোস্ত।' আমার চোখের সামনে সিবনের মূর্তি ভেসে উঠলো। শক্ত সমর্থ চওড়া শরীর বিরাট এক জোড়া গোঁফ। 'রাম রাম' বলে নমস্কার জানিয়েছিল। তার চোখে মুখে স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ। ভরতের জন্মের আগে থেকে যদি রামাবতারের সঙ্গে তার দোস্তি, তবে কি সে দোস্তের চরিত্র জানে না? ঘরনীর মন বোঝে না?

প্রশ্ন যেখানে, জবাবও সেইখানে। সেই জন্যই কি দুলারিকে এখনও মনিয়ার সঙ্গিনীর মতন দেখায়? যদিও সে ভরত, গোবিন, নুরির মা তবুও কি তাই তার চোখের তারায় এখনও কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের ঝিলিক। অথচ তার কথাবার্তা আচরণে কোথাও বাচালতার প্রকাশ নেই। কেবল বয়সের তুলনায় যা অধিক সেটা তার নায়িকা রূপ।

দুলারি দেখা দিল চালার দরজায়। হাতে হামানদিস্তা। দৃষ্টি আমার দিকে। আমি চোখ তুলে তাকালাম। দুলারি সহসা চোখ সরালো না। কয়েক মুহূর্ত আমার চোখে চোখ রেখে, এগিয়ে এলো উনোনের দিকে। সময় বহে যাবার পরে, আমি চমকে উঠলাম।

আবার তাকালাম ছুলারির দিকে। সে একটা বড় লোহার তাওয়া উনোনে তুলে দিচ্ছে। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। মনিয়া অবাক চোখে একবার দেখলো আমাকে, তারপর নানীকে। এবার মনিয়া কোথাও খেই হারিয়েছে।

আমি শুনছি, চরের পাড়ে পাড়ে জলের ছল ছল শব্দ। তারা ভরা আকাশ। বেঁটে ঝাড়ানো গাছটার উঁচু ডালের পাতায় হালকা বাতাসের দোলানি। আমি একটা সিগারেট ধরাবার আগে, নানীর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। নানী সিগারেট হাতে নিয়ে বললো, 'অব না পিওব বাবা, বাদে পিইবেনি।'

আমি সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগে, আর একবার পাঞ্জাবীর হাতা সরিয়ে দেখলাম। রাত্রি সাড়ে আটটা। ইতিমধ্যে ছুলারি গরম তাওয়ায় শুকনো লঙ্কা ছেড়েছে। বাতাসে তার ঝাঁজ। আমি দু পাশের চালাঘরের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলাম। নানী জিজ্ঞেস করলো, 'কহাঁ চলত হো রউয়া?'

বললাম, 'আসছি।'



যেমন কর্ম, তেমন ফল, কথাটা জানি। কিন্তু ভাগ্যটাকে বোধহয় একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। নিজের নাক কেটে তো পরের যাত্রা ভঙ্গ করিনি। নিজেরই যাত্রা ভঙ্গ করেছি। নাক যদি কাটা গিয়ে থাকে, নিজেরই গিয়েছে। এপার ওপারের মূলের কূলে যাওয়াতে, অনেকদিনের হাতছানির সাড়া দিয়ে এলাম। এমন বলতে পারবো না, গঙ্গার বুকে সবুজ রেখাটি আমাকে কোনোদিক থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু মূলে আর অকূলে রূপের ভেদে, চলমান জীবনের সুরে কোথায় একটা মিল রয়েছে। না হলে এই

নিরিবিলি চরের বুকেও জীবন বিচিত্রার এমন নাটকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো না।

দেখলাম, যে খাটিয়াটা ঝুরি প্রাক সন্ধ্যায় পেতে দিয়েছিল সেটা এখনও সেখানেই রয়েছে। আমার দৃষ্টি পশ্চিমের কূলে, যেখানে রাস্তার ধারে টিম টিম করে বিজলি বাতির বিন্দু জ্বলছে। ওখানেই আছে সেই ঘাট, যেখান থেকে ভরত পাটনীর নৌকায় এসেছিলাম। খাটিয়ায় বসবো ভেবেও, আমি আস্তে আস্তে পশ্চিমদিকে সাবধানে পা বাড়ালাম। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, কিন্তু পায়ের নীচে দেখতে পাচ্ছি না কিছুই। একটা টর্চ লাইট থাকলে ভালো হতো। সে কথা ভেবে কোনো লাভ নেই। অতএব সাবধানে চলছি। এ চলাটাও অর্থহীন। পশ্চিমের সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালেই ভরতরা নৌকা নিয়ে ফিরে আসবে না।

পায়ের নীচে মাটির ঢ্যালা। ভয় হচ্ছে, পাছে কোনো শস্য নষ্ট করি। খানিকটা যাবার পরেই মনে হলো ঝুরি আমার পাশ থেকে বলে উঠলো, 'কহাঁ যাতানি?'

আমি চমকে প্রথমে পিছন ফিরে তাকালাম। তারপরেই অন্ধকারের আবছায়ায়, আমার ডান দিকে দেখলাম, ঝুরি দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'ঘরে কি পিছে খাড়া বা।' ঝুরি জবাব দিল, 'তুহকে ইউর যায়ে দেখুতো চল আইলান। কহাঁ যাতানি?'

বললাম, 'কোথাও না, এমনি একটু পাড়ের কাছে যাচ্ছিলাম।'

ঝুরি কোনো কথা বললো না। অন্ধকার যতোটা মনে হয় ততোটা না। যাকে বলে নিকষ কালো। আকাশের নিচে, মাঝ গঙ্গায় আকাশ ভরা তারার আলো যেন অন্ধকারকে অনেকখানি হালকা করে দিয়েছে। আমি ঝুরির চোখ মুখ স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই চরের ধূলামাটি শস্য আর সরষের এবং

নারকেল তেলের মিশ্রিত একটা গন্ধ পাচ্ছি, আর ওর হাতের কাঁচের চুড়িতে কি তারার ঝিকিমিকি? চুড়িগুলোতে অস্পষ্ট ঝিলিক দিচ্ছে। আমার মনে হলো মুরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো ওর অভ্যস্ত চোখ এ অন্ধকারে আমার থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে।

আমি আবার পা বাড়াবার উদ্যোগ করে বললাম, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো?'

'আরে, তুহকে দিমাক খারাপ ভইল কা?' মুরি অনায়াসেই আমার একটা হাত টেনে ধরলো, 'ই কা তুহকে সহরেকে রাস্তা বা? গিরল যাই তো কা হোই?'

কথাটা হয় তো মিথ্যা না। কিন্তু আমার অস্বস্তিটা পতনের আশঙ্কার থেকে বেশি। রাত্রের নিরালা চর। মুরির বয়স যাই হোক। ওর মা নানী ভউজীর চোখে দৃশ্যটা কি খুব সহবত দেখাবে। অথচ ওর যা গোসা দেখেছি, জোর করে হাত টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করতেও দ্বিধা করছি। ও তখন বলতে আরম্ভ করেছে, 'এততি পরবন্ধ করতানি, তো তু কাহেঁ চল যাওবেকে মতলব করতানি?'

'পরবন্ধ' শব্দের অর্থ কী? অনুরোধ? আমি জানি, শিল্পাঞ্চলে এ জাতীয় ভাষা অনেকের মুখে শুনি, কিন্তু আমার পক্ষে তাদের সঠিক ভাষা বলা সম্ভব না। পঞ্চাশ দশকের স্মৃতিই কেবল আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না। আমার মতন কোনো বাঙালীর পক্ষেই, বিহারের বিভিন্ন দেহাতী ভাষাকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা অসম্ভব। ব্যাকরণের তো কথাই নেই। আর বাজার চলতি বাজার হিন্দির তো কোনো মাথা মুণ্ডই নেই। বললাম, 'মতলব তো কিছু করিনি। থাকবো ভেবে তো আসিনি।'

কথাটা বলতে বলতেই হোঁচট খেলাম। মুরি শক্ত হাতে

আমাকে সামলে নিয়ে হেসে উঠলো, 'দেখলেবানি কি? বাঙালীবাবু আমার কথা কাঁহে না মানছে?'

আমি পতন থেকে সামলে ওঠবার আগেই, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বাঙলা বলতে পারো?'

'থোড়া থোড়া সাকতবা।' মুরি হেসে জবাব দিল, 'হামিনলোগ সব বাঙলা বুলি জানি। বাঁশবেড়িয়া, শাগুঞ্জ হালিসহর, সবহি জায়গে 'পর আমার বহুত বাঙালী দোস্তানি আছে। উলোগ কহুঁ আমার কথা না বুঝে, না বুলতে জানে। আমি জানে। তুমি রামপরসাদকে মন্দির কখুন গেইছ?'

রামপ্রসাদের মন্দির না বলে, আমরা ভিটেই বলি। বললাম, 'অনেকবার গেছি।'

'আমি হর হপ্তেমে এক দো রোজ যাই।' মুরি ওর নিজের মতন বাঙলায় বললো, 'উধারে আমার পাঁচ সাত দোস্তানি আছে। আমার সাথে এ চৌরে পরে বেড়াইতে আসে।'

মুরির বাঙলা কথা শুনে ভরতের বাঙলা বুলি আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আমি পদে পদে বুঝতে পারছি, একলা চলতে গেলে ইতিমধ্যেই আমার কয়েকবার পতন ঘটতো, আর তার চোট সামলাবার জন্য অন্ধকার চরে আমাকে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। মুরি এখন আমার একটি হাত ধরে নেই। কাঁধের চাদরটা ও অন্য হাতে মুঠি পাকিয়ে ধরেছে। সেই সঙ্গে পাঞ্জাবীর গলাটাও। আমার শরীরের সঙ্গে ওর শরীরের স্পর্শে আমার যদি বা অস্বস্তি হচ্ছে, ওর কোনো সংকোচই নেই। সংকোচের অবকাশ কি ওর শরীরে মনে একেবারেই অনুপস্থিত? অথচ, আমারই অস্বস্তি না হবার কথা। কিন্তু সংবাদগুলো সবই নতুন, যদিও আশ্চর্যের বা অবিশ্বাস্য মোটেই মনে হচ্ছে না। চরের বুকে বাস বটে, মূলের কূলে যাতায়াত আছে। জন্মকাল

থেকে বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা। বাঙালী সই সখী না জোটাটাই অস্বাভাবিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মুরি মানে কী?'

'মুরি?' ও হেসে উঠলো, 'মুরি না কহ, মুরী।' দীর্ঘ ই-কারটাও টেনে আওয়াজ করলো, 'মুরী তো পঞ্ছী আছে বাঙালীলোগ পাখী বলে।'

মুরি না, মুরী। তাও আবার পাখী। মনিয়াকে ময়না ভেবেছি, কারণ ওটা ওরকম জানা। 'মুরী নামে কোনো পাখীর নাম আজতক শুনিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী পাখী?'

'উ আমি জানি না।' মুরী জবাব দিল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'মুরী তুমি তো আমাকে কখনো দেখনি, আমাকে থাকতে বলছো কেন?'

মুরী কোনো জবাব দিল না। বরং এবার যেন ও নিজেই হোঁচট খেতে গিয়ে সামলে নিল, আর ওর নারকেল তেলের গন্ধ খোঁপাটা আমার কাঁধে ঠেকলো। আবার কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারো নি?'

'কী কথা?' মুরীর স্বরে যেন অন্যমনস্কতা।

আমি আমার কথার পুনরুক্তি করলাম, 'তুমি আমাকে কখনো দেখনি, জানো না, তবু আমাকে থাকতে বলছো কেন?'

মুরী পরিষ্কার ওর নিজের ভাষায় জবাব দিল, 'হমে না জানত।'

অদ্ভুত উক্তি। ও জানে না, কেন আমাকে থাকতে বলছে। তারপরই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কেন মনে হলো, তোমার ভউজী বললে আমি থাকবো কী না?'

'উ হমেসে সুরতবালী না?' মুরী বললো, এবং অন্ধকারেই আমার মুখের দিকে তাকালো।

মুরীর তাকানোটা আমার অনুমান, কিন্তু ওর কথার মধ্যে যে

একটা গুরুতর ইঙ্গিত ছিল, সেটা মিথ্যা ভাবিনি। ইঙ্গিতটাকে গুরুতর বললো কী না, বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওর কথার মধ্যে কোথাও দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। একে ঈর্ষা বলবো, না সহজ প্রকৃতি বলবো ? ওর মনে হয়েছে, মনিয়া ওর থেকে সুন্দরী, অতএব আমি তবে তার কথায় চরে রাত্রিবাস করতে পারি। ঈর্ষা হোক আর প্রবৃত্তিজাত হোক, এ আচরণকে আমি 'রমণী ধরম' মাত্র বলতে পারবো না। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বোধহয় সমান। কেবল বয়স আর অভিজ্ঞতা মানুষের বাহ্য প্রকাশকে সংযত করে। মনের তলিটা বাজে একই তালে। নুরী ওর বয়স আর অভিজ্ঞতার ওজনে, নিজেকে প্রকাশ করেছে।

আমার চোখের সামনে মনিয়ার স্বাস্থ্যোন্নত শ্যামাঙ্গিনী মূর্তি ভেসে উঠলো। নুরীর থেকে সে সুন্দরী কী না জানি না, তার কৌতুকদীপ্ত চোখ, চর শিউরে তোলা হাসি, সবই পুরুষের প্রথম নজর কাড়ার চুম্বকে ভরা। অন্তত মনে মনে এ কথাটা স্বীকার না করলে, নিজের কাছে মিথ্যাবাদী হতে হয়। কিন্তু রূপের ভেদে মনের গতি নানা ধারায় বহে। প্রকৃতির দুরন্ত আয়ুধ মনিয়ার সর্বাঙ্গে। এমন কি তার চোখে মুখে কথায় বলায়। যে কারণে মনে হয়েছিল এমন রমণীর চলার দাপেই বোধহয় দামিনী কাঁপে। কিন্তু নুরীকে প্রথম দর্শনেই বুঝেছি, ওর কিশোরী শরীরে ও মনে প্রকৃতির সকল আয়ুধ, মহা সমারোহে ওর ধমনীতে সংকেত দিয়েছে।

আমি ওদের দুজনের রূপের বিচার একবারও করি নি। রমণীর চরিত্র ভেদে, দুজনকে আলাদা করে দেখেছি। আমি হেসে বললাম, 'তোমাকে কে বলেছে, মনিয়া তোমার থেকে সুন্দরী ?'

'আমি সমঝতে পারি।' নুরী বললো।

অন্ধকারে এখন আর অনুমান না, স্পষ্টই বুঝতে পারছি, নুরী আমার মুখের দিকে দেখছে। ও কি অন্ধকারেও আমার মুখ দেখতে

পাচ্ছে? আমি আবার হেসে বললাম, 'কিন্তু আমি তো দেখছি, তুমি অনেক বেশি সুন্দরী।'

মুরী আমার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ঝুট কাঁহে কহতানি?'

'না, মিথ্যা বলিনি। আমি জানি, তুমি বড় হলে আরও সুন্দরী হবে।'

মুরী কোনো জবাব দিল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লো। আর এগোবার উপায় নেই। দেখলাম, আমাদের পায়ের নীচে, জলের স্রোতে আলোর রেখা। ছল্‌ছল্‌ শব্দ বাজছে। আলোর রেখা কি ওপারের আলোর না তারার বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, চরের বুকের এই খেলাটা সংসারের ধরা ছোঁয়ার বাইরে না, অবাস্তবও না। আকস্মিকতার চমক আছে, তথাপি জীবনটাকে তার আপন আলোয় দেখলে, স্থান ও কাল ভেদে, এ একটা জীব ধর্মের সহজ খেলা। কিন্তু কবির ভাষায় 'সহজীয়া' করণ কারণ না।

কয়েকটি মুহূর্ত চুপচাপ। অনুভব করছি, চরের মাটিতে শস্য ফলানো কিশোরীর হাত ভিজে উঠছে। হঠাৎ পিছন থেকেই মনিয়ার চেনা স্বরে গানের গুনগুনানি শোনা গেল। কথাগুলো দ্রুত, কেবল শুনতে পেলাম, 'লে আওল ফুলহার···দেই ওরতারি···।'

আমি ঝটিতি ফিরে দাঁড়ালাম। মনিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিন্তু মুরী আমার হাত আরও শক্ত করে ধরলো। মনিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে চলে যেতে লাগলো। তার মিলিয়ে যাওয়া অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। মুরীর শক্ত করে ধরা হাত কিঞ্চিৎ নরম হলো। ডেকে বললো, 'কা বাতাওয়ে আইলবানি হোই ভউজী?'

একটু দূর থেকে মনিয়ার হাসির ঝংকার শোনা গেল, তারপরে, 'কুছ না ননদী, পঞ্ছী ধায়ে মন হরই······।'

মুরী ফিক করে হেসে উঠলো। আমার হাত ধরে ফিরে যেতে পা বাড়িয়ে আবার ডেকে উঠলো, 'এ ভউজী, মা বোলাওত কি?'

'মসলা বিধিলেকেবারে, সাম্নু তোহে যায়ে কহতানি কি তুহে না দেখলেন বা।'

মনিয়ার স্বর ভেসে এলো, 'হম বোলাওত।'

নুরী আমাকে নিয়ে চলতে চলতেই, এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'কুছু না কহে, হমে যাতানি।' নুরীর কথা শেষ হবার আগেই দূর থেকে একাধিক পুরুষের গলা ভেসে এলো। তার মধ্যে, সব থেকে চড়া আর মোটা স্বরে গান ভেসে এলো, 'রাঘব রাম কহ্লে যা'ই, জগ 'পরে অওর রহু না।'......

নুরী বলে উঠলো, 'বাপু ভাইয়ালোগন আ গেইলান। চাচা গানা গাওত।'

বুক থেকে একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস উঠে এলো। যাক, আমার পার্টনা আর নৌকা আসছে। অন্ধকারে ঘড়িতে এখন ন'টা। ওদের আসতে আসতে সাড়ে ন'টা। তারপরে......



তারপরে সবটাই হিসাবের বাইরে। চরের পুরুষরা ফিরে এসে আমাকে দেখে প্রথমটা থ! তারপরে প্রায় এক সঙ্গে নানী, দুলারি, মনিয়া আর নুরী কথা বলতে আরম্ভ করে দিল। ওরা যে কে কী বললো, প্রায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখলাম, পুরুষের দল চর গঙ্গা আকাশ কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। খানিকটা অনুমান করা গেল, আমার চরে থেকে যাওয়াটা তাদের চোখে পড়েনি বলেই হাসির হর্‌রা।

হররার পরেই বোধহয় গর্‌রা। কারণ এমনিতেই রামাবতার আর সিবনকে আমার আদৌ স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। রামাবতার

দীর্ঘদেহী, তামাটে রঙের তার মাথার চুল বড়, গোঁফজোড়াও বিরাট, এবং চুল গোঁফের রঙও তামাটে দেখলাম। তার আর সিবনের চোখ ছুটি বেশ লাল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দুজনে দুদিক থেকে আমাকে ধরে একেবারে মাটিতে বসে পড়লো। সিবন তো আমার গলা জড়িয়েই ধরলো, বললো, 'ও রউয়া, আজ রাতেমে তোহে ছোড়েব নাই। হামলোগনকে সাথে রহল যা।'

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই রামাবতার আমার হাঁটুর ওপর প্রায় নুয়ে পড়ে বলল, 'হ, রউয়াকে আজ ছোড় না যাইল, পাকড়ি রাখ লেইবান।'

রমণী মহলে হাসির ধুম। আর আমার ঘ্রাণে দেশী সুরার প্রবল গন্ধ। রামাবতার সিবন, দুজনেরই। দুপুরের সিবন, আর এই সিবন, আকাশ পাতাল তফাত্। ভরত আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার সেই বাঙলা বুলি ছাড়লো, 'কাঁহে যাইবেন বাবু, হামিনলোগ গরীব হইতে পারে-হ, আপনি হামিনলোগের মেহমান আছেন। ভগবান আপনাকে রাখিয়ে দিছে, নানী মাতারি বলছে, আজ থাকিয়ে যান।'

কথাবার্তা চলছিল, দক্ষিণের উনোনের ধারে নিকানো অঙ্গনে। ভরতের চোখ লাল না। তার ভাব ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে বাপ চাচার সঙ্গে পান করে আসে নি। গোবিন্ হাসছে লাজুক লাজুক। বছর পনর ষোল বয়সের ছেলেটিরও মনের কথা চোখ খুলে ফুটেছে, কেবল কথাই নেই।

কিন্তু কাকে কী বলবো। সকলে এক সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে। মুরীর চোখ আমার চোখের দিকে। কিন্তু রামাবতার আর সিবন এর পরে আমাকে বোধহয় মাটিতে শুইয়ে ফেলবে। তারা এখন কেবল আমাকে জড়িয়ে ধরে রউয়া রউয়া ক'রে যাচ্ছে। আমি দুলারির দিকে তাকালাম। সে মজা দেখছে। মনিয়া মুরীর

পাশে দাঁড়িয়ে, এখন ওর কোলে নেংটিটা জেগে উঠে, বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখছে। সাদা কালো পাহারাদারটি একবার রামাবতারের মুখ চাটছে, আর একবার সিবনের। আর ল্যাজ নেড়ে নেড়ে নানা রকম শব্দ করছে। মাতাল ছুটির সেদিকে খেয়ালই নেই।

ভরত মায়ের দিকে ফিরে বললো, 'এ মাতারি, এ ছুনোকো তু ঘর কাঁহে না লে যাতানি ? বাবুকে তখলিব্ হওয়েনি।'

দুলারি এগিয়ে এলো। দু হাত বাজিয়ে ডাকলো, 'শুনহো, তু হুনো ঘরে চলতানি, উঠ, উঠ হো।'

ভোজবাজীর মতন কাজ হলো। দুজনেই মুখ তুলে তাকালো। ঘাড়ের ওপর দুজনের মাথাই যেন বাতাসে দুলছে। দুজনেই দুলারির দুহাত ধরে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু মুখের বুলি এক, 'রউয়াকে ছোড়ব না।'

'হঁহ, ঠিক বা। আর দুনো ঘবে চলতানি।'

দুলারি দুজনকেই দুহাত ধরে, পশ্চিমের বড় চালায় ঢুকে গেল। ভরত এসে আমার পাশে বসলো। ইনিও দেখছি গন্ধমাদন। ওরে, সরাব না গঞ্জিকা। হাসতে হাসতে বললো, 'বাবু, ভগবানজীর মর্জির ঔপর কিসিকে কথা চলে না। নাহি তো, আপনাকে ছোড়ে গেইলাম কী করে, আপনে বলেন।'

মনিয়া ধমকের স্বরে বললো, 'আর উঠতানি। বাবুকে ভুখ্ লাগলবা, খানা দেওবানি। তু লেড়কাকে ঘরে পরে লেই যাহ।'

'হুঁ হুঁ।' ভরত উঠে মনিয়ার কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে, পুবের একটা চালায় ঢুকে গেল। নানী হুঁকা টানছে, আর হাসছে। বললো, 'মনিয়া, বাবুকে সাথে হমে ভি খানা দেই দে।'

মুরী ছুটলো পশ্চিমের চালায়। চোখের পলকেই বেরিয়ে এলো হাতে একটি ঝকমকে কাঁসার থালা আর গেলাস নিয়ে। মনিয়া হেসে আমার দিকে একবার তাকিয়ে, পশ্চিমের চালাতেই ঢুকলো।

উনোনের ধারেই ভোজ্য বস্তু সব রয়েছে। রুটি আর তরকারি। নুরী থালায় এক গোছা রুটি আর এক পাশে গাদা খানেক তরকারি বেড়ে দিল আমার সামনে। ইতিমধ্যে কখন মাটির কলসী বাইরে এসেছে, দেখি নি। জল গড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ই শহর কলেকে পানী লা।'

নানী এসে বসলো আমার পাশেই। মনিয়া একটা এলুমিনিয়ামের থালায় রুটি তরকারি বেড়ে নানীর সামনে দিল। ঘটিতে করে জল দিল।

কোথা থেকে কী ঘটে গেল, কিছুই যেন বুঝতে পারলাম না। আমার সামনেই ভরত আর গোবিন খেয়ে নিল। নেংটিটার খাওয়া বোধহয় আগেই হয়ে গিয়েছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে, এ রুটির তরকারির স্বাদ আলাদা। তরকারির মসলাটা কি জানি না। তবে দুলারির হাতে মাথে অনেক ভোজবাজী।

পশ্চিমের বড় চালায়, দক্ষিণের বেড়া ঘেঁষে, ভরত নিজে আমার খাটিয়া পেতে দিল। তারপরে সে যখন কাঁথা বালিশ বিছানা টেনে আনলো, আমি বাধা না দিয়ে পারলাম না। খোলা আকাশের নীচে শুতে পারি, সত্যি। কিন্তু জীবন ধারণের সব ছক পেরিয়ে আসতে পেরেছি, তা বলতে পারবো না, ক্ষেত্র বিশেষে বিছানায় থেকে ভূমি শয্যা সহনীয়, কিন্তু বিছানা না।

আমি আমার পশমী চাদরটা সব ভাঁজ খুলে গায়ে চড়ালাম। শোবার উদ্যোগ করতেই, নুরী ছুটে এলো। নাকে গন্ধ লাগলো ন্যাপথলিনের। ঘরে আলো না থাকলেও, বুঝতে পারলাম ওর হাতে রয়েছে বড় একখানি মোটা আর ধোয়া বিছানার চাদর। দ্রুত হাতে সেটি পেতে দিল খাটিয়ার ওপর। আর বালিশের মতন একটা কিছু। হাত দিয়ে মনে হলো, একটা চৌকো পুঁটলি। নুরী বললো, "গন্ধা কিছু নাই আছে, সব নয়া কাপড়ার পুঁটলি।'

অতঃপর আর কোনো কথা চলে না। নুরী কেবল আমার কানের কাছে মুখ এনে নীচু স্বরে বললো, 'হরদেওকে কৃপা।'

চরের হাতছানিটাই এতকাল দেখে এসেছি। সেই ডাক যে এমন ঘটনা ঘটাবে, ভাবতে পারি নি। এ চর কি অঘটনঘটন-পটিয়সী ?

আমি শোবার পরেও, বাইরে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। দুলারি যে কোথায় গেল দুজনকে নিয়ে, কিছুই জানি না। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। ঘরের মধ্যে। কোথায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই চৌকো লণ্ঠনটিই মনে হলো। তার আলোয় দেখলাম, পাশাপাশি দুটো খাটিয়ায় ভরত আর গোবিন শুয়ে আছে। আরও খানিক উত্তরে, মাটিতে পাতা বিছানার ওপর সিবনকেও চিনতে পারলাম।

খাটিয়া থেকে নেমে চালার ঝাঁপে হাত দিলাম। টান দিতে বুঝলাম, কোথাও আটকানো আছে। হাতড়ে পেলাম, একটি কঞ্চির সঙ্গে, দড়ির ফাঁস লাগানো। ঘুম আসছে না। রাতের চরটা দেখবার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠছে। নিঃশব্দে দড়ির ফাঁস খুলে বাইরে এলাম। আকাশের কৃষ্ণ স্বচ্ছতায় কেমন একটা কুয়াশার ঝাপসা ছায়া। তারাগুলো আবছা দেখাচ্ছে। আমি পায়ে পায়ে পুবের দিকে গেলাম। মূলের কূলে রাস্তায় তেমনি আলো। পুবে কিছু অন্ধকার। পশ্চিমে ডানলপের কুঠির আলো উজ্জ্বল। তারপরেই চোখে পড়লো, পুব দিকে, নদীর বুকে নৌকায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। কুতু আর বটা কি জাল টানছে ? সম্ভবতঃ।

হঠাৎ স্পর্শে চমকে উঠলাম। সাদা কালো পাহারাদার আমার পায়ের কাছে এসে, ল্যাজ নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে। এখন আর আমি শত্রু নেই। ওর দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে, আমার চোখ

পড়লো ঝাড়ালো গাছটির নীচে। সেখানে গায়ে গায়ে পাশাপাশি ছুটি মূর্তি। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। কারা ?

অবাক হবার অবকাশ পেলাম না, মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে আছে দুলারি আর রামাবতার। কিছুই জানি না, দুলারির জীবনটা কোন্ চালে চলে। তবে, এটা বুঝেছি, জীবনে সবকিছু বলে কয়ে ছকে চলে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃতি তার আপন হাতে কিছু গড়ে তোলে। দুলারির দু হাত বাড়িয়ে দুই পুরুষকে নিজের গায়ে টেনে নিয়ে চলে যেতে দেখেই বুঝেছিলাম জীবনটা দলিলপত্র না।

তবুও হায় মূলের কূলের মানুষ, আমি যেন লজ্জায় আর সংকোচে কুঁকড়ে গেলাম। আগে জানলে কখনও ঘরের বাইরে আসতাম না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তার থেকেও সাবধানে চালার ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। কোনোরকমে ঝাঁপের ফাঁস পরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙলো, দেখলাম, পাশের খালি খাটিয়ায় নুরী বসে কী যেন একটা সেলাই করছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ভেবেছিলাম, সকালেই চরের পর্ব শেষ। তা হলো না। মাতাল কেউ ছিল না বটে। কিন্তু এক রাত যদি থেকেই গেলাম, আর একটা বেলা নয় কেন ? কিন্তু খেতি চাষবাসের কাজ ? আজ ছুটি। রামাবতার কাজ কামাই করেছে। মনিয়ার পরিষ্কার উক্তি আমি নাকি গত রাত্রে নুরীর কথায় থেকে গিয়েছি। আজকের একটা বেলা, সকলের কথা রাখতেই হবে।

সম্মোহন বলবো, না সংক্রমণ বলবো, জানি না। রাজি হয়ে গেলাম। কুতু আর বটা তখন জাল টেনে মাছ তুলছে। ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, অবাক। ভাবতে পারে নি, আজ সকালেও

আমাকে দেখবে। আমার লক্ষ্য ওদের মাছের দিকে। কারণ, আগেই জেনে নিয়েছি, সিবনের পরিবারের সকলেই মৎস্যাশী। কিন্তু দু একটি মাঝারি বোয়াল ছাড়া, সবই ছোট মাছ। দুটি বোয়াল কিনে নিয়ে এলাম। কুতু বটাও কৌতূহল দমন করতে পারলো না। সিবনদের চালাঘরের সীমানায় দুজনেই এলো। বটা হেসে বললো, 'বাবু বুঝি অগো লগে চড়াইভাতি করবেন?'

বললাম, 'একরকম তাই।'

দুলারি তার সেই ছুরি নিয়ে মাছ কাটতে শুরু করলো। বটার চড়াইভাতি কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। ঘর ছাড়া জীবনে, এ আমার একটা নতুন স্বাদ। মন-ভাসির টানে, চরে ঠেকে যাওয়া এক নতুন রঙ্গ। তবে, সেই কথাটাই মনে মনে বারে বারে বললাম, 'মানুষ, তোমার রূপের তুলনা নেই। জীবনের শেষদিনেও যেন তোমাদেরই নমস্কার করে যেতে পারি।'

আমাদের চরের ভোজনপর্ব শেষে, এবার বিদায়ের পালা। ভরত পাটনী প্রস্তুত। নানী চোখের জল মুছছে। মনিয়া হাসতে পারছে না। দুলারি যেন এক অলৌকিক দেবীর মতন বারে বারে আমার সঙ্গে চোখাচোখি করলো। আর নিমন্ত্রণ জানালো, নুরীর গাওনার সময় যেন আমি আসি। ফাগুয়ার সময় একবার খবর নিলেই গাওনার দিনটি জানতে পারবো।

কিন্তু নুরী কোথায়? মনিয়া পুবের একটা ঘর দেখিয়ে বললো, 'উ ঘরকে ভিতর না।'

আমার এখন আর সংকোচ নেই। পুবের সেই ঘর দেখিয়ে বললো, 'উ ঘরকে ভিতর না।'

আমার এখন আর সংকোচ নেই। পুবের সেই ঘরে গিয়ে দেখলাম, নুরী বেড়ার গায়ে মুখ চেপে, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না। ডাকলাম, 'নুরী।'

ও ফিরলো না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, ডাকলাম, 'নুরী।'

ও ফিরে তাকালো। লাল চোখ ছুটো ভেজা। হাসবার চেষ্টা করলো। তারপরে বললো, 'সাচ্ কি তুমি আমার গাওনায় আসবে?'

বললাম, 'আসবো, তোমার মাকে বলেছি।'

'আমাকে বল।' নুরী বললো।

বললাম, 'তোমাকেও বলছি।'

নুরী তখন ওর বাঁ হাতের মুঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তা হলে এটা রাখ, গাওনার সময় এসে আমাকে দিও।' ও মুঠি খুলে আমার সামনে ধরলো।

দেখলাম, নতুন এক প্যাকেট সিঁছুর। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কেন দিচ্ছ?'

'তাহলে তুমি কথা রাখবে।' নুরী বললো, 'সিন্দুর নিয়ে কেউ ঝুটা বলে না।'

এই কথা শোনার পরে হাত বাড়াতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। তারপরে সিঁছুরের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে পকেটে রাখলাম। তাকালাম নুরীর মুখের দিকে। কিশোরীর মুখটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। চোখের পাতা নামিয়ে নিল। আমি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ভরতের সঙ্গে নৌকায় যখন উঠলাম, তখন জোয়ার চলেছে। উজানের টানে এসেছিলাম, উজানের টানে নিয়ে যাচ্ছে। নৌকা ভাসলো। সকলেই চরের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে। হয় তো আমার প্রাণের শক্তি কম। চরের ওপরে সারি সারি মূর্তিগুলো চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল, কাঁপতে লাগলো। মনে মনে বললাম, 'আবার আসার কথা যদি না রাখতে পারি, ক্ষমা করো।'...

ক্ষমা পেয়েছি কিনা জানি না। তবে স্মৃতির পটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখনো বুকের কাছে ছু'হাত জড়ো করি।